নফসের বিরুদ্ধে লড়াই

বাহিরের শত্রু আমার কী ক্ষতি করবে?
যখন আমার সবচে' বড় শত্রু, আমার নফস।
- ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)

লেখকের কথা

মাঝে মাঝে একাকী নিভৃতে চোখ বুজে মনে মনে ভাবি—আমি কার দ্বারা সবচে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? কে আমার জীবন চলার পথে ক্ষতি সাধনের কাটা ফেলে রাখে? কে আমার উজ্জ্বল প্রদীপ নিভিয়ে চলার পথ রুদ্ধ করছে? কে আমাকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? কেন আজ পথ খুজে পাই না? কেন আজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হেঁটে, সঠিক রাস্তাকে উপেক্ষা করে বক্র রাস্তা বেছে নিয়েছি? কেন আজ আলোর মশাল -এর পরিবর্তে কয়লা নিয়ে ঘুরছি?

আবারো ভাবি—কেন আজ বিভিন্ন পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ি? কেন নিজের সাথে নিজেই এই বলে ছলনা করছি—"আজ-ই ফার্স্ট, আজ-ই লাস্ট। আজকেই শেষ বার। কাল থেকে ভালো হয়ে যাব। একদম কোমর বেঁধে নামব। আর পাপ কাজে জড়াব না। আর কোনো দিন নামাজ কাজা করব না।" এই কথাগুলো বলার পর, পরক্ষণেই তা কেন ভুলে যাই? কেন বার বার পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ি?

এই কারণগুলো খুঁজতে গিয়ে কেবল শয়তান আর নফসের প্ররোচনাই খুঁজে পেলাম। বুঝে গেলাম— এ- সব কিছুর পিছনে নফস এবং শয়তানের-ই হাত রয়েছে। তবে সেখানে শয়তানের তুলনায় নফসের ভূমিকাটাই বেশি। তাই ভাবলাম— নফস নিয়ে আলোচনা করা দরকার। সবাইকে এই নফসের ব্যাপারে সতর্ক করা দরকার। নফস কী? নফসের দ্বারা আমরা কীভাবে প্রভাবিত? নফসের দ্বারা আমরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

হচ্ছি—তা সবার সামনে উঠে আসা দরকার। সাথে সাথে এ-ও জানা উচিত—আমরা কীভাবে নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করব? কীভাবে নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখব?

যখন দেখলাম, সকল পাপের মূলে এই নফসের হাত রয়েছে। যখন ভাবলাম, নফস ঠিক তো সবকিছুই ঠিক—তখনই আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে লিখতে শুরু করলাম - 'নফসের বিরুদ্ধে লড়াই'। দুর্বল হাতে তুলে নিলাম অতি কঠিন একটি কাজ। বিভিন্ন সময় থমকে গিয়েও, আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল রেখে এগিয়ে গেছি মূল লক্ষ্যে। লিখতে গিয়ে প্রায়শই খেয়েছি হোঁচট, বারবার খেয়েছি ধাক্কা। অবশেষে, আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে লেখা সম্পন্ন হয়েছে। লেখার পর পুনরায় পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে—এটা যেন আমার জন্যই লেখা, এখানে যেন আমাকেই রিমাইন্ডার দেয়া হচ্ছে।

লেখার পর পুনরায় পড়তে গিয়ে প্রতিটি পাতায় পাতায় যখন নিজেই ধাক্কা খেয়েছি, তখন ভাবলাম—এই বইটা প্রত্যেকের উচিত, একবার হলেও চোখ বুলিয়ে পড়ে নেয়া। প্রত্যেকের উচিত, বইটি ছুঁয়ে দেখা।

যাহোক, বই সম্পর্কে আর কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না। সবার কাছে একটাই আবেদন—একবার হলেও বইটি ছুঁয়ে দেখবেন। অতঃপর, বই থেকে পাওয়া মেসেজগুলো নিজের উপর প্রয়োগ করবেন। সাথে সাথে আমি অধমের জন্য এবং বইটির জন্য একটু দুআ করবেন। আল্লাহ তাআলা যেন বইটি কবুল করে নেন; সাথে সাথে আমাকেও। আ-মিন।

অতিরিক্ত দু-একটা কথা বলতে চাই—পুরো বইটা যেহেতু নফসের ওপর লেখা, তাই শয়তানের যাবতীয় কার্যকলাপ, তার কৃত পরামর্শ, তার সব কিছু এড়িয়ে গেছি। বইটি পড়ার পর অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন—লেখক শুধু নফসের কথাই বললো, আর শয়তানকে ধোয়া তুলসীপাতা বানিয়ে দিল—এই ধারণা যেন না হয়, এজন্যই সতর্ক করে দিলাম। শয়তানের কথা ভুলে গেলে চলবে না, শয়তান থেকে অসতর্ক থাকলেও চলবে না।

আর হ্যাঁ, মানুষ মাত্রই ভুল। তাই, বইয়ের কোনো অংশে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা ভুল কিছু পরিলক্ষিত হলে, তাৎক্ষণিক আমাদের জানাবেন। ইনশা'আল্লাহ, পরবর্তী মুদ্রণে তা ঠিক করার চেষ্টা করব। যে-কোনো বইয়ে টুকটাক ভুল ত্রুটি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। জানেন তো—ইমাম শাফেয়ী রহি. তিনি তার একটি গ্রন্থ ১০০ বার সম্পাদনা করার পরেও বলেছিলেন—'এখনো আমার মনে হচ্ছে, তাতে অনেক ভুল-ত্রুটি রয়েই গেছে।'

সুতরাং, আমরা কেউই হলফ করে বলতে পারব না—আমাদের লেখা বইটি পরিপূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত। এরকম বলার সাহস কারোই নেই।

মাও. মাহমুদ বিন নূর
লেখক ও সম্পাদক
২৩/০৭/২০২১

বইটি যে-ভাবে সাজানো হয়েছে

|| প্রথম পরিচ্ছেদ ||

|| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ||

|| তৃতীয় পরিচ্ছেদ ||

|| চতুর্থ পরিচ্ছেদ ||

|| প্রথম পরিচ্ছেদ ||

নফস কী? তা কীভাবে ডাইভার্ট করবেন?

নফস বলা হয়, মানুষের কামনা, বাসনা, চাহিদা ইত্যাদি -কে। এক কথায় যাকে বলা হয় প্রবৃত্তি। আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির সময় তার স্বভাবে কতিপয় চাহিদা দান করেছেন। যেমন: আহারের চাহিদা, যৌবনের চাহিদা, কর্তৃত্বের চাহিদা, ক্ষমতার চাহিদা, লোভ-লালসা ইত্যাদি। সব গুলোকে এক কথায়, 'জৈবিক চাহিদা' বলা যায়। আর এগুলোই হলো নফস বা প্রবৃত্তি।

নফস তার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আবার তিন প্রকার। মূলত নফস একটি, কিন্তু কাল পরিক্রমায়, স্বভাবের তাড়নায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাই বলা যায়—অবস্থানের দিক দিয়ে নফস তিন প্রকার।

১. নফসে আম্মারাহ

২. নফসে লাওয়্যামাহ

৩. নফসে মুত্বমায়িন্নাহ

১. নফসে আম্মারাহ (প্রতারক আত্মা):

অর্থাৎ যে নফস, মানুষকে কুপ্রবৃত্তি ও জৈবিক কামনার দিকে আকৃষ্ট করে। সব সময় খারাপ চিন্তা-ভাবনা পোষণ করিয়ে রাখে। সব সময় অনৈতিক চাহিদা পূরণার্থে ব্যস্ত রাখে। সব সময় খারাপ কাজে উৎসাহিত করে। এই নফস সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আছে...

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

অনুবাদ: আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম-প্রবণ। কিন্তু সে নয়—যার প্রতি আমার রব অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার রব, অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[১]

২. নফসে লাওয়্যামাহ (অনুশোচনাকারী আত্মা):

অর্থাৎ যে নফস, অন্যায় করার পর আমাদের হৃদয়ে অনুশোচনার উদ্রেক করে। কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন নফসে লাওয়্যামাহ -এর কথা উল্লেখপূর্বক কসম খেয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন....

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

অনুবাদ: আরো শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।[২]

তাফসিরে মা'রিফুল কুরআনে নফসে লাওয়্যামাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, নফসে লাওয়্যামাহ এমন একটি নফস—যা নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ, কৃত গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে। সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে—"আরও বেশি সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? হযরত হাসান বসরি রহি. নফসে লাওয়্যামাহ-এর তাফসির করেছেন, 'নফসে মু'মিনা'। তিনি বলেন, আল্লাহ'র কসম! মু'মিন তো নিজেকে সর্বদা সর্বাবস্থায় ধিক্কায় দেয়।

সৎকর্মসমূহেও আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। কেননা, আল্লাহ'র হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে, তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

---

[১] সূরা ইউসুফ: আয়াত, ৫৩

[২] সূরা কিয়ামাহ: আয়াত, ১-২

৩. নফসে মুত্বমায়িন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা):

অর্থাৎ যে নফস, সকল কালিমা থেকে মুক্ত এবং যাবতীয় মহৎ ভাবনায় পরিতৃপ্ত। সমস্ত খারাপ কর্ম-প্রবণতা থেকে মুক্ত। এ- প্রশান্ত আত্মা সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন...

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাও—সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।[৩]

তাফসিরে মা'রিফুল কুরআনে নফসে মুত্বমায়িন্নাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে—এ- নফস আল্লাহ'র প্রতি তার সৃষ্টিগত ও আইনগত বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট; আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট। মহান রাব্বুল আলামিন এসব প্রশান্ত নফসকে সম্বোধন করে বলেন—আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

মূলত নফস একটি। অবস্থা ভেদে তার গুনে পরিবর্তন আসে। নফস আমাদের কর্মের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। যদি তা লাগামহীন হয়ে যায়, তখন তা আম্মারায় পরিণত হয়। কিন্তু, যখন নফসে লাগাম পড়ানো হয়,তার গোলামী পরিত্যাগ করা হয়, তখন ধীরে ধীরে তা মুত্বমায়িন্নায় পরিনত হয়। এজন্যই বলা হয়—নফসে আম্মারাহ প্রায় সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। তাই, আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে—নফসে আম্মারাহকে নফসে মুত্বমায়িন্নায় ডাইভার্ট করা। যাতে নফসের গোলামী থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং তার প্ররোচনা থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়।

নফসকে কীভাবে ডাইভার্ট করবেন?

নফসে আম্মারা'র কাজ হচ্ছে, সর্বদা খারাপ কাজের প্ররোচনা দেয়া। নফসে আম্মারাহ সবসময় আপনাকে আমাকে খারাপ কাজের প্রতি উৎসাহ

[৩] সূরা ফজর: আয়াত, ২৭-২৮

প্রদান করে। আর অন্য দিকে, নফসে মুত্বমায়িন্নাহ সর্বদা আল্লাহ ও রাসূল সা. -এর হুকুম আহকাম এর প্রতি যত্নবান। সর্বদা এই নফস, আপনাকে আমাকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ দিতে থাকে।

সুতরাং, যার নফস, 'নফসে আম্মারা' সে সবসময় শুধু গোনাহের দিকেই ধাবিত হতে থাকে। আর যার নফস, 'নফসে মুত্বমায়িন্নাহ' সে সবসময় কল্যাণকর কাজের দিকেই এগিয়ে থাকে।

তাই, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে এবং বেশি বেশি নেক কাজ করতে আমাদের নফসে আম্মারাকে নফসে মুত্বমায়িন্নায় পরিণত করতে হবে।এখন কথা হচ্ছে—এই নফসে আম্মারাকে কীভাবে নফসে মুত্বমায়িন্নায় ডাইভার্ট করবেন?

বেশি কিছু নয়; শুধু নফসের বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তি। জানেন, সব কিছুর মূলে হচ্ছে এই নফস। এই নফসের চাহিদার ব্যাপারে যদি জোরজবরদস্তি করা যায়, তবে ঐ নফস, আম্মারা থেকে এমনি এমনি নফসে মুত্বমায়িন্নায় পরিনত হবে। আর এটা যদি করতে পারেন, তবে মনে করবেন—বিরাট এক অর্জন ছুঁতে যাচ্ছেন।

যাহোক, আমরা সবসময় নফসের চাহিদাকে প্রাধান্য দিচ্ছি....

*** শরিয়তের নির্দেশ—তোমরা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করো। আর নফস বলে—আরে, আজকে বাসায় নামাজ পড়, একদিন বাসায় নামাজ পড়লে তেমন ক্ষতি হয়ে যাবে না; নামাজ আদায় হলেই তো হলো। এটাই হচ্ছে, আম্মারা'র কাজ। আপনার ক্ষেত্রেও যদি এরকম হয়ে থাকে—জামাতে যাওয়ার নিয়ত করলে ভিতর থেকে এরকম বাধা আসে, তবে বুঝে নিবেন, আপনার নফস এখন আর মুত্বমায়িন্নাহ -এর পর্যায়ে নেই; তা আম্মারায় পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় আপনার উচিত, নফসকে এসলাহ করা। তাকে আম্মারা থেকে মুত্বমায়িন্নায় ডাইভার্ট করা। নফসকে এসলাহ করার জন্য এরকম পরিস্থিতিতে আপনাকে নফসের ওপর জোরজবরদস্তি চালাতে হবে। তখন যদি আপনি নফসের বিরুদ্ধে

জোরজবরদস্তি না করে, বাসায়-ই নামাজ পড়ে নেন, তাহলে কেমন জানি নফসের বিরুদ্ধে আপনি পরাজয় বহন করে নিলেন। আর যদি তার বিরুদ্ধে গিয়ে, তার সাথে লড়াই করে, মসজিদে যেতে পারেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি নফসের ওপর বিজয় অর্জন করলেন।

*** আপনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে জিকির করবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন সময় নফস বলে—'আরে উঠ, জিকির রাস্তায়ও করতে পারবি।' এই বলে নফস আপনাকে ধোঁকা দিতে চাইলো। আপনিও নফসের কথামতো উঠে গেলেন। নফসের চাহিদার প্রাধান্য দিয়ে দিলেন। দীনি আলোচনা চলছে। পাঁচ মিনিট শুনতেই অধৈর্য্য হয়ে গেছেন। অপরদিকে ক্রিকেট খেলা দেখছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে মাত্রই খেলা দেখতে শুরু করলেন। কুরআন তেলাওয়াত করতে বসেছেন। পাঁচ মিনিট তেলাওয়াত করতেই মনে হয়, এক ঘন্টা তেলাওয়াত করে ফেলেছেন। অন্য দিকে প্রেমের উপন্যাস পড়তে বসেছেন, ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হচ্ছে; টের-ই পাচ্ছেন না—এগুলোই নফসে আম্মারার কাজ। এমতাবস্থায় নফসের ওপর জোরজবরদস্তি করে যদি তা ডাইভার্ট করতে না পারেন, তবে ধ্বংস অনিবার্য!

নফসের প্রলোভন, নফসের প্ররোচনা, নফসের ধোঁকা, নফসের গোলামী থেকে রক্ষা পেতে, অবশ্যই তাকে আম্মারা থেকে ডাইভার্ট করে মুত্বমায়িন্নায় রুপান্তর করতে হবে। অন্যথায় নফসের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগত-ই হারাতে হবে।

তাই, নফসকে এসলাহ করার জন্য, আম্মারা থেকে মুত্বমায়িন্নায় ডাইভার্ট করার জন্য অবশ্যই নফসের উপর জোরজবরদস্তি চালাতে হবে। নফস যা চাইবে তা করা যাবে না; সবসময় এর বিপরীত করতে হবে। কারণ, নফসে আম্মারা সারাক্ষণ আপনাকে আমাকে খারাপ কাজের দিকেই উৎসাহ দিবে।

কে সবচে' বড় শত্রু, শয়তান নাকি নফস?

এক

শয়তান হচ্ছে এডভাইজার, আর নফস হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। শয়তান পরামর্শ দিয়ে থাকে, আর নফস তা বাস্তবায়ন করে। শয়তান মানুষকে পাপকাজের পথ দেখিয়ে দেয়; আর নফস আপনাকে আমাকে নিয়ে সে পথে হাঁটে। তো দেখা যাচ্ছে—নফস এবং শয়তান দু'টোই আমাদের শত্রু। আমাদের দ্বারা যতগুলো পাপ কাজ সংঘটিত হয়, সব কিছুর পিছনে এ- দু'জনের হাত রয়েছে। তাহলে কে সবচে' বড় শত্রু? শয়তান, নাকি নফস?

অনেককে দেখা যায়—বিভিন্ন পাপ কাজ করার পর বলে থাকে, 'আরে ভাই! আর বলবেন না, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এটা করে ফেলেছি, ওটা করে ফেলেছি।' একবারও কিন্তু বলে না—'নফসের ধোঁকায় এটা করেছি, নফসের ধোঁকায় ওটা করেছি।' সে মনে করে, শয়তান-ই তার সবচে' বড় শত্রু। অথচ, নফস নামক এক ভয়ংকর শত্রু যে তার অভ্যন্তরে বসে আছে, সেটা কি তার খেয়াল আছে? নফস আপনাকে আমাকে নিয়ে খেলছে। তার ইচ্ছামত নাচাচ্ছে। আর আজ আপনি আমি ভাবছি—শয়তান-ই সবচে' বড় শত্রু; নফস আবার কীসের শত্রু!

আচ্ছা বলুন তো—শুধুমাত্র শয়তান-ই যদি আমাদেরকে গুমরাহ করে, তো শয়তানকে গুমরাহ করেছে কে? শয়তান-ই যদি আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে, তো শয়তানকে পথভ্রষ্ট করলো কে? শয়তানের পূর্বে তো কোনো শয়তান ছিলো না, তাহলে শয়তানকে দিকভ্রান্ত করলো কে? শয়তানকে দিকভ্রান্ত করেছে তার 'নফস'। নফস তাকে অহংকারী বানিয়েছে। নফস

তাকে উদ্যত করেছে। নফস তাকে দিশেহারা করেছে। নফস তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। এতদসত্ত্বেও, কেন আজ নফসের ব্যাপারে আমরা এত উদাসীন?!

ইবলিশ অনেক ইবাদত গুজারি ছিলো। সে পথভ্রষ্ট হওয়ার আগে, এত বেশি ইবাদত বন্দেগী করেছে, তার সেই ইবাদতের সাথে আমাদের ইবাদতের তুলনা করলে, নিজের ইবাদতকে খুবই স্বল্প মনে হবে। এতদসত্ত্বেও, নফস কিন্তু তাকে দিকভ্রান্ত করে দিয়েছে। তাহলে এই নফস আপনাকে আমাকে দিশেহারা করার জন্য কি যথেষ্ট নয়? এই নফস আপনাকে আমাকে বিপথগামী করার জন্য যথেষ্ট নয়? তাহলে আজ নফসের ব্যাপারে কেন এত বেখেয়াল? আরে, পাপ কাজের চিন্তা-চেতনা লালন করে এই নফস। পাপ কাজ সম্পাদন করে এই নফস। পাপ কাজের পরিকল্পনা করে এই নফস। আর শয়তান? শয়তান তো কেবল পরামর্শ দেয়; পথ দেখিয়ে দেয়। এজন্যই তো ময়দানে মাহশারে শয়তান বলবে,'আমার কী দোষ? আমি তো তোর হাত ধরে গোনাহ করাইনি; আমি তো কেবল রাস্তা দেখিয়েছি, বাকি সব তো তুই নিজেই করেছিস।' শয়তান যদিও এ-কথা বলবে, তবু সে অপরাধী।

যাহোক, যেটা বলছিলাম—শয়তান আমাদের বড় শত্রু; নাকি নফস? এখন নিজেই চিন্তা করে দেখুন, কে আমাদের বড় শত্রু, শয়তান নাকি নফস। মনে রাখবেন, শয়তানের পূর্বে কিন্তু কোনো শয়তান ছিলো না; নফস তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাই ধরে নিন, আমাদের সবচে' বড় শত্রু নফস। এটা আমাদের ভিতরেই অবস্থান করে। এটাই আমাদের বড় শত্রু। এই নফসের উপর যদি লাগাম দেয়া যায়, তবে শয়তানের পরামর্শ কোনো কাজেই আসবে না। নফস ঠিক হলে শয়তান আপনাকে কখনোই বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

মনে রাখবেন—নফস কিন্তু শয়তানের বন্ধু। এই বন্ধুর হাত ধরেই শয়তান আমাদের মধ্যে বিচরণ করে। শয়তান সর্বপ্রথম নফসের সাথে বন্ধুত্ব করে; অতঃপর, তাকে বিভিন্ন পাপকাজের পরামর্শ দেয় এবং বিভিন্ন অশ্লীল, নোংরা কাজকে তার কাছে সুশোভিত করে তোলে। ফলে, নফস তখন সে

কাজ বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে যায়। তাই, সর্বপ্রথম আমাদের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে হবে; নফসের উপর লাগাম দিতে হবে। যদি নফসের উপর লাগাম না দিই, তাহলে শয়তান এসে নফসের সাথে বন্ধুত্ব করে আপনার আমার উপর পাপের বোঝা চাপিয়ে দিবে।

দুই

আমরা জানতে পেরেছি—নফস এবং শয়তানের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন রয়েছে। দু'জন-ই এক নায়ের মাঝি। একজন পাল তুলে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, অপরজন সেদিকে বৈঠা চালায়। তারা একজন ছাড়া অন্যজন কিছুটা অপূর্ণ। শয়তান পথ দেখিয়ে দেয়, আর নফস সেই পথে হাঁটতে শুরু করে। শয়তানের সমস্ত কাজ নফসের উপর নির্ভরশীল। নফস ছাড়া সে কখনোই তার কৃত-পরিকল্পনায় সফল হতে পারে না।

ধরুন—মনে মনে পরিকল্পনা করলেন আপনি সিনেমা দেখতে যাবেন। আর এই পরিকল্পনা আপনার নফস আপনাকে বাতলে দিয়েছে। আপনার নফস সিনেমা দেখার জন্য মুখিয়ে আছে। এদিকে তার মনে এক ধরনের ভয় কাজ করছে—ইশ, সিনেমা দেখতে যাবো—কেউ যদি দেখে ফেলে? আমার মা-বাবা যদি জেনে ফেলে? আর তাছাড়া, টাকাই-বা পাবো কোথায়? এমতাবস্থায় আপনার নফস হতবুদ্ধি হয়ে যায়। মনে মনে ভাবতে থাকে, টাকা কোথায় পাবো? তখন-ই শয়তানের পরামর্শ শুরু হয়ে যায়। শয়তান তখন চুরি করার নানান পন্থা বাতলে দেয়। শুধু তাই নয়—কীভাবে সবার অগোচরে সিনেমা হলে যাওয়া যায়, সেই পরামর্শ শয়তান-ই দিয়ে থাকে। তখন আপনার নফস নতুন করে সাহস যুগিয়ে ফেলে। ফলে, তার পক্ষে কর্মটি সম্পাদন করা খুবই সহজ হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে শয়তান এবং নফসের এক অনন্য সেতুবন্ধন। তাই আমাদের উচিত, নফস এবং শয়তানের সেই সেতুবন্ধনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা।

আপনি শয়তানের উপর কোনো ধরনের প্রভাব খাটাতে পারবেন না। কেননা, সে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাহিরে। তবে, নফস কিন্তু আমাদের গন্ডির ভিতরে। সে আমাদের ধরাছোঁয়ার ভিতরেই। তাই, শয়তানের কুপরামর্শ থেকে বাঁচতে হলে, অবশ্যই আপনার আমার প্রভাব নফসের উপর খাটাতে হবে। এর জন্য উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে—তাদের উভয়ের চিন্তা-চেতনা কর্মপদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে ভিন্নতা তৈরি করা। এতে করে উভয়ের সেতুবন্ধন এমনি এমনি ছিন্ন হয়ে যাবে।

আমরা সাধারণত যখন বন্ধু নির্বাচন করি, তখন ঠিক আমাদের মতন একজনকেই বেছে নিই। যেমন: কোনো বন্ধু নির্বাচন করার পূর্বে আমরা দেখে নিই—তার চিন্তা-চেতনা, তার স্বভাব, তার চালচলন ইত্যাদি বিষয় আমার মতনই কি-না! যখন অপর জনের চিন্তা-চেতনা, চালচলন , স্বভাবজাত ইত্যাদি আমাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়, তখন আমাদের মাঝে একটা বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমরা জানি, বিপরীত চিন্তাধারার, বিপরীত স্বভাবের দু'জন ব্যক্তি কখনো বন্ধু হতে পারে না! ঠিক তদ্রুপ, নফস আর শয়তান যদি বিপরীতমুখী হয়, তবে তাদের মাঝেও কখনো বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারবে না। এজন্যই, আপনার নফস যখন শয়তানের কর্মপদ্ধতি, শয়তানের চিন্তা-চেতনা, ইত্যাদি সর্ববিষয়ে বিপরীত হয়ে যাবে, তখন শয়তান এবং নফসের মধ্যে কোনো ধরনের সেতুবন্ধন থাকবে না। আর তাদের উভয়ের মধ্যে যদি একটা যোগসূত্র না থাকে, তখন ধীরে ধীরে নফস আপনার আমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে; নফসের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

এজন্য যেটা করতে হবে—শয়তান যা চায়, এর বিপরীত কাজটাই আপনাকে আমাকে করতে হবে। যেমন: শয়তান চায় আপনি ফজরের সময় নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকেন। সাথে সাথে নফসও আরামের জন্য এরকমটাই চায়। এখন আপনার কাজ হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে শয়তানের চাহিদার বিপরীত করা। শয়তান চায় আপনি গোনাহের মধ্যে লিপ্ত হন। ঠিক তখন যদি আপনি গোনাহ্ থেকে বিরত থাকতে পারেন,

দেখবেন আপনার নফস ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। ধীরে ধীরে সে এসলাহ হচ্ছে। তাই, সৎ কাজের জন্য, নফসের উপর সব সময় জোরজবরদস্তি করতে হয়। পক্ষান্তরে, গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যও, নফসের বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তি চালাতে হবে। যখন আপনি আপনার জোরজবরদস্তি বহাল রাখবেন, তখন নফস-ও তার খারাপ চিন্তা ধারার অস্তিত্ব হারাবে। আর যখন নফসও তার খারাপ চিন্তা ধারার অস্তিত্ব হারিয়ে এসলাহ হয়ে যাবে, তখন সে সম্পূর্ণভাবে শয়তানের চিন্তাধারার বিপরীত হয়ে যাবে। আর যখন নফস শয়তানের বিপরীত হয়ে যাবে, তখন এমনি এমনি তাদের মধ্যকার কমিউনিকেশন বন্ধ হয়ে যাবে।

এতকিছু করার পর শয়তান আগের মত ঠিকই নফসকে কুপরামর্শ দিবে; কিন্তু নফস যখন এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তখন শয়তানও বিরক্তবোধ করবে। এমতাবস্থায়, নফসকে নিয়ন্ত্রণে আনা আপনার আমার জন্য অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

নফসের ভিত্তিতে সৃষ্টির সেরা জীব

এক

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। ফেরেশতাদের ওপরও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে—এটা আমরা কমবেশি সবাই জানি। তবে এটা কি জানি, সেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভে নফসেরও ভূমিকা রয়েছে? ফেরেশতারা সব সময় আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিয়োজিত থাকে। কখনো তারা আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে না; কিন্তু মানুষ আল্লাহ তাআলার কত হুকুমই-না অমান্য করে। তবুও মানুষকে ফেরেশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এর কারণ, ফেরেশতাদের মধ্যে নফস নেই, নেই কোনো অনুভূতি শক্তি। তাদের মধ্যে কেবল জীবনী শক্তি বিদ্যমান; কোনো অনুভূতি শক্তি নেই। তাদের পেটের ক্ষুধার অনুভূতি নেই; নেই যৌবনের ক্ষুধার অনুভূতি। কিন্তু মানুষের মধ্যে সেই অনুভূতি দান করা হয়েছে। আর সেই অনুভূতি শক্তির নাম হচ্ছে নফস বা প্রবৃত্তি। আল্লাহ তাআলা মানুষদের নফস দান করেছেন, যার কারণে সমস্ত সৃষ্টি কুলের মধ্যে মানুষ সেরা। নফস যখন আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে, তখন সেই নফসকে এসলাহ করা আমাদের উপর কতটা গুরুত্বপূর্ণ—একবার কি ভেবে দেখেছেন? আপনি নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করলেই আপনি সকলের উপর শ্রেষ্ঠ। যদি তা না করে নফসের ধোঁকায় পড়ে তার গোলামী করতে শুরু করেন, তখন কি আর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে? না, নফসের গোলামী করে, নফসকে অপবিত্র রেখে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে অবশ্যই আপনাকে নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং বিজয় অর্জন করতে হবে। বস্তুত, আপনি আমি কি সেটা করছি?

দু'জন ব্যক্তিকে দু'টি জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল, বলা হলো—দু'জনকে এই জঙ্গল অতিক্রম করে অপর প্রান্তে যেতে হবে। একটি জঙ্গল একদম

নিরাপদ— নেই কোনো বাধা, নেই কোনো ভয়ংকর জানোয়ার। অপরদিকে, অন্য জঙ্গলে রয়েছে নানান বাধা-বিপত্তি, পথিমধ্যে রয়েছে খাল-বিল ইত্যাদি। তার ওপর সাপ, ভয়ংকর জানোয়ার—বাঘ, ভাল্লুক,সিংহ, ইত্যাদি তো রয়েছেই। তারা দু'জনেই জঙ্গল অতিক্রম করে অপর প্রান্তে গেল। একজন আরামসে—কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই; কোনো জানোয়ারকে হত্যা করা ছাড়াই। অপরদিকে, অন্যজন নানান বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করে, সাপ, বাঘ,ভাল্লুক, সিংহকে হত্যা করে অপর প্রান্তে পৌঁছেছে। এখন বলুনতো—কাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হবে? অবশ্যই তাকে, যে নানান বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে, ভয়ঙ্কর জানোয়ারকে হত্যা করে অপর প্রান্তে পৌঁছেছে। তাকেই পুরস্কৃত করা হবে, যে নানান বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করেছে ; তাকে নয়—যার রাস্তায় কোনো বাধা ছিলো না।

ঠিক এভাবেই, ফেরেশতাদের ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, ফেরেশতাদের কোনো জৈবিক চাহিদা নেই। পাপ কাজে জড়ানোর সেই মন মানসিকতা নেই। নেই তাদের কোনো অনুভূতি শক্তি। নেই যৌবনের চাহিদা, নেই ভক্ষণের চাহিদা। তাই, তাদেরকে কোনো কিছুর মোকাবেলা করতে হয় না। কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় না।

নফস হচ্ছে লবণের মতো। লবণ ছাড়া যেমনি-ভাবে খাবারের কোনো মূল্য নেই; তেমনি নফস ছাড়াও মানুষের কোনো মূল্য নেই।

আপনি গরুর গোশত রান্না করলেন, কিন্তু লবণ দিলেন না। এটা কি আর খাবারের উপযুক্ত থাকবে? লবণ ছাড়া তরকারির স্বাদ পাবেন? পাবেন না। লবণ ছাড়া তরকারির কোনো মূল্যই নেই। এটা কেউ খেতেই পারবে না। ঠিক নফসের ক্ষেত্রেও এরকম—নফস ছাড়া আপনি যতই ইবাদত করেন, তার কোনো স্বাদ থাকবে না। ওই ইবাদতের কোনো বিনিময় থাকবে না। যেমন: ফেরেশতাদের নফস নেই। তাদের ইবাদতের কোনো মূল্য নেই এবং এই ইবাদতের কোনো বিনিময়ও নেই। তারা শুধু তাদের রবের হুকুম মান্য করছে। তাদের আমলের দরুন তারা কিছুই লাভ করবে না। পক্ষান্তরে,

যাদের মধ্যে নফস রয়েছে অর্থাৎ 'মানুষ', তারা যদি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলে, সাথে সাথে তার আমলনামায় শত শত নেকি যুক্ত হয়ে যায়। যতই ইবাদত করবে, যতই নেক আমল করবে; এর বিনিময় হিসেবেও পরকালে পাবে অফুরন্ত পুরস্কার। আর এটা হয়ে থাকে কেবল নফসের-ই কারণে। এই নফস যদি না থাকতো, তবে কি সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানিত হতো? এই নফসের কারণেই আপনার শ্রেষ্ঠত্ব; আপনার কবুলিয়্যাত।

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়—শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয় কর্মের গুণে। আর সবকিছুর ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার কারণ হচ্ছে, আমরা নফসের বিরুদ্ধে মুজাহিদ। যে ব্যক্তি নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় অর্জন করেছে, নফসের গোলামী থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে—সে-ই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন—আপনি আমি কি সত্যিই নফসের বিরুদ্ধে মোজাহিদ? সত্যি কি আমরা নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি? সত্যি কি আমরা নফসের হুকুম অমান্য করে রবের হুকুম মেনে চলছি? যদি আপনার উত্তর হয়, 'না', তাহলে আপনি কীসের সৈনিক, কীসের মুজাহিদ? আর কোন ভিত্তিতে আপনি সৃষ্টির সেরা জীব?

আচ্ছা, আপনি আমি সৃষ্টির সেরা জীব—এটা কি আমাদের কাজে-কর্মে, আমাদের চিন্তা-চেতনায় প্রকাশ পায়? বলতে পারছেন না? তাহলে আসুন, নিজের অবস্থান সম্পর্কে আরেকটু জানি। আসুন নিজেকে হায়ওয়ান -এর সাথে একটু পর্যালোচনা করে দেখি...

আল্লাহ তাআলা হায়ওয়ান -এর ওপর মানুষকে এক বিশেষ বিশেষণে বৈশিষ্ট মন্ডিত করেছেন। সেটা হলো—আকল, বুদ্ধি, বিবেক। যেন তা দ্বারা সে ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম, ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ও অনুধাবন করতে পারে। শুধু তাই নয়—এর দ্বারা যেন, তার জৈবিক চাহিদার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম-এর মধ্যে পার্থক্য করে চলতে পারে। বস্তুত, এতেই তার মনুষত্ব ও মানবিক দিকের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে। তাই, কেউ যদি তার নফসের

গোলামী করে—ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম বিবেচনা না-করে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে, তবে তার আর হায়ওয়ান -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে কি?

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা ছাড়া—মানুষ, জিন, হায়ওয়ান, সবার মধ্যে নফস দিয়েছেন। সবার মধ্যে একটা জৈবিক চাহিদা দান করেছেন। আর সেই চাহিদা হলো—যৌন চাহিদা, খাবারের চাহিদা, আরাম আয়েশের চাহিদা, ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে যেমনি-ভাবে এই চাহিদাগুলো বিদ্যমান। ঠিক তদ্রুপ, হায়ওয়ানের মধ্যেও এরকম জৈবিক চাহিদা রয়েছে; তারাও তাদের নফসের তাড়নায় এই চাহিদাগুলো পূরণ করে। (মানুষ এবং হায়ওয়ানের মধ্যে চাহিদার ক্ষেত্রেও কমবেশির তারতম্য রয়েছে) তবে হায়ওয়ান এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য, মানুষকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। যেন, সে এটার মাধ্যমে ভালো-মন্দ সবকিছু পার্থক্য করতে পারে। হালাল-হারাম চিহ্নিত করে জীবন-যাপন করতে পারে। কিন্তু, আজকাল দেখা যায়—নফসের তাড়নায় কিছু মানুষ, তাদের আকল, বিবেক, বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছে। ফলে, সব কিছু তার পশু-সুলভ হয়ে গেছে।

বস্তুত, হায়ওয়ান কেবল তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণে ব্যস্ত। পেট আর লিঙ্গ হচ্ছে তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। তাই বলা যেতে পারে—মানুষের মধ্যে যারা শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে ব্যস্ত; পেট আর লিঙ্গ তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর, তারা তো পশুর চেয়েও আরো বেশি নিকৃষ্ট। পশুর চেয়ে আরো বেশি নিকৃষ্ট এ- কারণে যে—মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য শরীয়তের কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে; রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। তাই, সে যদি জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য সীমা অতিক্রম করে ফেলে, তখন তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। পক্ষান্তরে, পশুর ক্ষেত্রে এরকম সীমাবদ্ধতা নেই। নেই তাদের কোনো বিধি-নিষেধ; নেই কোনো হিসাব-নিকাশের দায়বদ্ধতা। কিন্তু মানুষ?

এখানে আমি কেন পশুর আলোচনা করলাম? করেছি এ কারণে যে, আজকাল অনেক মানুষ পশু-সুলভ হয়ে গেছে। তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধি সবকিছু খুইয়ে ফেলেছে। তারা এখন আর ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। হালাল-হারাম মেনে জীবন-যাপন করে না। তাদের জীবন-ব্যবস্থা হয়ে গেছে অনেকটা পশুদের মত। বললাম না—পশুর চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, পেট এবং লিঙ্গ। এখন আমাদের সমাজের কিছু মানুষেরও চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর, পেট এবং লিঙ্গ। তারা খাওয়া-দাওয়া আর যৌবনের চাহিদা মিটানো ছাড়া, অন্য কিছু ভাবেই না। তার কারণ হচ্ছে, সে নফসের কাছে পরাজিত; তার নফস লাগামহীন। আর এই লাগামহীন নফস, তাকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বানিয়েছে।

দুই

নফসকে তুলনা করা যায় জমির সাথে...। জমি যখন আগাছায় ভরপুর হয়ে যায়, তখন জমি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলে। ঠিক তদ্রূপ, কিছু কিছু নফস যখন ইসলামবিদ্বেষী নানান কর্মকান্ড নামক আগাছায় ভরপুর হয়ে যায়, তখন ঐ নফসও তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলে। সব জমি এক নয়; কিছু কিছু জমি আছে, যাতে উৎকৃষ্ট মানের ফসলের পরিবর্তে, নানান ধরনের আগাছা, লতাপাতা, কাটা-বৃক্ষ জন্ম নেয়। ঠিক তদ্রূপ, কিছু কিছু নফসও এরকম—যাতে ইসলামবিদ্বেষী নানান কর্মকাণ্ড, ফেতনা-ফাসাদ, অপসংস্কৃতি, কুফরী, শিরক ইত্যাদি বাসা বাঁধে।

এজন্য, জমি থেকে উৎকৃষ্টমানের শস্য পেতে হলে তার যত্ন নিতে হবে, আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, উত্তম ভাবে হাল-চাষ করতে হবে। পরিমাণ মতো পানি দিতে হবে, কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তবেই সেখান থেকে ভালো ফসল আশা করা যাবে। ঠিক আমাদের নফসটাও এরকমই। যখন দেখবেন, নফস তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলেছে, লাগামহীন হয়ে গেছে, তখনই অনতিবিলম্বে তাকে এসলাহ করতে হবে, তার প্রয়োজনীয় খাবারের বন্দোবস্ত করতে হবে। যেমন: জিকির-আজকার,

কুরআন তেলাওয়াত, নফল ইবাদত ইত্যাদি। অতঃপর, তার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। তবেই নিজের আত্মিক উন্নয়ন ঘটবে। আর যদি আগাছা মুক্ত না রাখেন, তবে উক্ত আগাছা তাকে সামনে আগাতে দিবে না। নফসকে এসলাহ করতে সর্বদাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য, নফসের মধ্যে যত আগাছা রয়েছে, তা সময় থাকতেই ছাঁটাই করতে হবে। যেমন: বিভিন্ন বদ-অভ্যাস, অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা, খারাপ মনোভাব, ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে—জমি'র আগাছা পরিষ্কার করা খুবই সহজ, কিন্তু নফসের আগাছা দূর করা খুবই কঠিন। এজন্য, নফসের আগাছা দূর করতে যা যা প্রয়োজন, তা-ই করতে হবে। এক্ষেত্রে, নফসের বিরুদ্ধে তো যেতে হবেই; নয়তো আগাছা পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। আর যখন আপনি আগাছা পরিষ্কার করার জন্য নফসের বিরুদ্ধে যাবেন, তখন সে হা-হুতাশ করতে থাকবে; তার কষ্ট হবে। তাই, কষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না; নফসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তবেই নফসকে আগাছামুক্ত করা যাবে; অন্যথায়, আগাছায় আচ্ছাদিত হয়ে নফস তার আলোর দিশা হারাবে।

নফসের হাতে তুলে দিচ্ছি, আমাদের ক্ষতি সাধনের যাবতীয় অস্ত্র!

কৃত অপরাধের কারণে সাধারণত অপরাধীদের কারাবন্দি করে রাখা হয়। যেন সে আর কোনো অপরাধ করার সুযোগ না পায়। এমনকি, আমরা আমাদের শত্রুদের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে তাকে গৃহবন্দি করে রাখার চেষ্টা করি। সে যে-সকল জিনিস দ্বারা আমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে, সে-সব জিনিস তার হাতের নাগাল থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি—যেন ঐ সব ব্যবহার করে আমাদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। মোটকথা, আত্মরক্ষার জন্য যা যা প্রয়োজন, সব কিছুরই বন্দোবস্ত করি। কেননা, আমরা কেউ-ই চাই না—শত্রুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। এজন্য, সর্বদাই শত্রুর মোকাবেলায় পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে থাকি।

শত্রুর মোকাবেলায় সজাগ থাকতে হবে, এটাই স্বাভাবিক! কেউ যদি শত্রুর মোকাবেলায় অসতর্ক থাকে, তবে সে তার শত্রুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। কেউ যদি শত্রুর ব্যাপারে গাফেল থাকে, তাহলে সুযোগ বুঝে সে আক্রমণ করবেই— এ- কথা ভেবে সকলেই তার শত্রুর ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করে। একজন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি তার ক্ষতি সাধনকারী ব্যক্তির ব্যাপারে কখনো উদাসীন থাকতে পারে না।

আমরা আমাদের শত্রুদের ভয় করি। তার আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। তার মোকাবেলায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিই। পারলে তাকে কারাবন্দি করার চেষ্টা করি, যেন তার আক্রমণের সমস্ত দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। অথচ, আমরা আমাদের নফসের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিই না। সে একজন বড় অপরাধী, তবুও তাকে কারাবন্দি করি না। সে আমাদের সবচে বড় শত্রু, তবু তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিই না। নফস যে-সকল হাতিয়ার ব্যবহার করে আমাদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করছে, তা থেকে

বেঁচে থাকার চেষ্টা তো দূরের কথা; উল্টো তার হাতেই সকল উপকরণ তুলে দিচ্ছি।

যদি একজন শত্রুর হাতে ক্ষতি সাধনের অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়, তখন সে আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, আমাদের ক্ষতি করবে, আমাদের বিপদে নিপতিত করবে—এটাই তো স্বাভাবিক। ঠিক নফসের ক্ষেত্রেও এরকম। আমরা যদি আমাদের নফসের হাতে ক্ষতি সাধনের যাবতীয় আসবাব, যাবতীয় উপায়-উপকরণ তুলে দিই, তখন সে আমাদের ক্ষতি না করে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে— আমরা কীভাবে আমাদের নফসের হাতে আমাদের ক্ষতি সাধনের অস্ত্র তুলে দিচ্ছি? আসুন জেনে নিই, কীভাবে আমরা আমাদের নফসের হাতে আমাদের ক্ষতি সাধনের যাবতীয় অস্ত্র তুলে দিচ্ছি.....

নফসের তাকাযা অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা:

আজ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন যে—কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ সম্পাদনের ভিত্তি স্থাপন করে, তখন আমরা তাকে বাধা না দিয়ে, সংবর্ধনা জানাই। আমাদের সুশীল সমাজের বক্তব্য হয়—সে যা করছে তাকে করতে দাও, তার কাজে কোনো ধরনের বাধা দিও না, তার স্বাধীনতাকে হরণ করো না। যে ব্যক্তি যে কাজে শান্তি পাচ্ছে; তাকে তা-ই করতে দাও। যে ব্যক্তি যা খেয়ে মজা পাচ্ছে, তাকে তা-ই খেতে দাও। তার কাজে, তার পরিকল্পনায়, তার জীবন ব্যবস্থায় বাধা'র দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে না।'

বাস্তবতা এটাই—আজকাল খারাপ কাজের কোনো বাধা নেই। না ব্যক্তিত্বের বাধা, না আইনের বাধা, আর না উপায়-উপকরণের বাধা। মোটকথা, ব্যক্তি এবং খারাপ কাজের মাঝখানে কোনো দেয়াল নেই। যখন ইচ্ছে তখনই খারাপ কাজ সম্পাদন করতে পারছে। যখন ইচ্ছে তখনই তার সাহওয়াত পূরণ করতে পারছে। যখন ইচ্ছে তখনই মজা ভোগ করতে

পারছে। আমরাই সমস্ত খারাপ কাজের দরজা উন্মোচন করে দিচ্ছি, আর তার সূত্র ধরেই নফস সমস্ত খারাপ কাজ সম্পাদন করছে। আমরাই নফসের হাতে খারাপ কাজের আসবাবপত্র তুলে দিচ্ছি, ফলে এখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সে খারাপ কাজ সম্পাদন করতে পারছে।

ক | অসৎ কর্মে রাষ্ট্রীয় কোনো বাধা-বিপত্তি নেই। ছেলে-মেয়ে অবাধে মেলামেশা করছে—এ ব্যাপারে আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা নেই। পার্ক, মল, থিয়েটারে—ছেলে-মেয়ের নির্জন বাসেও নেই কোনো বাধা। ফলে, নফস তার অশ্লীল মনোবৃত্তি খুব সহজেই পূরণ করতে পারছে।

খ | এখনো দেশের হাজার হাজার হোটেলে চলছে রমরমা দেহ ব্যবসা। রয়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নানান শ্রেণীর পতিতালয়। যেখানে একজন যুবক খুব সহজেই তার যৌন চাহিদা মিটিয়ে আসতে পারছে। খুব সহজেই নফসের চাহিদা পূরণ করতে পারছে। খুব সহজেই হরেক রকম নারী সে উপভোগ করতে পারছে।

গ | আজ শিশু থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ—সবার হাতেই স্মার্টফোন। বাচ্চারাও আজকাল এডাল্ট ফিল্মের সাথে পরিচিত। এই মোবাইল যুগের পূর্বে ১৮ বছরের একজন যুবক যা চিনতো না, আজ ৮ বছরের বাচ্চাও তা চিনে। ফলে, একটা ছেলে কিশোর অবস্থায়ই পর্ণ আসক্ত হয়ে পড়ছে। খুব সহজেই মোবাইলে নীল ছবি দেখে নফসে আম্মারার চাহিদা পূরণ করতে পারছে।

এছাড়াও অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যা সমাজ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। সমাজের এই চিত্রের কারণে নফস খুব সহজেই তার চাহিদা নিবারণ করতে পারছে। খুব সহজেই সে আমাদের ব্যবহার করে নানান অপকর্ম সম্পাদন করতে পারছে। আমরা খুব সহজেই তার হাতে সকল অশ্লীলতার উপকরণ তুলে দিচ্ছি। ফলে, হাতের নাগালে পেয়ে সে আরো বেশি নিকৃষ্ট পথে হাঁটছে। খুব সহজেই তা ব্যবহার করে আমাদের ক্ষতি সাধন করছে। আমাদের দ্বারা যাবতীয় অশ্লীল মনোবৃত্তি পূরণ করছে। অথচ আমরা ভুলে বসেছি—সে

আমাদের সবচে বড় শত্রু! তার আক্রমণ থেকে বাঁচতে, তাকে প্রতিহত করতে উচিত ছিল—সতর্কতা অবলম্বন করা; তার মোকাবেলায় পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সে যে-সকল উপকরণ ব্যবহার করে আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা উৎখাত করা। প্রয়োজনে তাকে কারাবন্দি করা, যেন তার কোনো কর্মপরিকল্পনা আমাদের উপর বাস্তবায়িত না হয়। কোনো চাহিদা যেন আমাদের ব্যবহার করে বাস্তবায়ন করতে না পারে। কিন্তু আফসোস, আজ আমরা তার ব্যাপারে খুবই উদাসীন। তার বিরুদ্ধে লড়াই করার মনোভাব প্রকাশ করি না। উল্টো, তার হাতেই তুলে দিই, আমাদের ক্ষতি সাধনের সকল মাধ্যম।

এজন্য, সর্বপ্রথম নফসের অশ্লীল কাজ সম্পাদনের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে হবে। তার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে হবে। কাজ সম্পাদনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ বন্ধ করতে হবে। তার হাতের নাগাল থেকে যাবতীয় হারাম উপকরণ দূরে রাখতে হবে। নয়তো নফসের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা প্রায় অসম্ভব!

আজ-ই ফার্স্ট, আজ-ই লাস্ট

এক

কখনো নফসের চাহিদার পরিসমাপ্তি ঘটবে না। যত দিবেন ততই চাইবে। যখন আপনি নফসের চাহিদা অনুপাতে চলবেন, তখন সে আপনাকে আস্তমতো ব্যবহার করবে। সে আপনাকে এভাবে ধোঁকা দিবে—নফস বলে,'আমার আম খেতে ইচ্ছে করছে!' কিন্তু আপনার পকেটে টাকা নেই। তখন নফস বলে,'যা, চুরি করে নিয়ে আয়। তবু আম খেতে চাই।' এমতাবস্থায় আপনি নফসকে বলেন,' চুরি করা ভালো না। তাই চুরি করা যাবে না।' তখন নফস বলে, 'আরে, আজকেই তো! আর করব না।' তখন আপনি নফসের ধোঁকায় পড়ে, চুরি করে ফেললেন। একবার আপনাকে দিয়ে চুরি করিয়ে সে কান্ত হয় না; পরের দিন আবার জাম খাওয়ার জন্য চুরির পথে অগ্রসর করে। এভাবে প্রতিনিয়ত একটার পর একটা নতুন কিছু চাইতেই থাকে। কিন্তু তবু সে পরিতৃপ্ত হয় না। হাতে থাকুক বা না-থাকুক, অসৎ উপায়ে হলেও আপনার দ্বারা তার মনোবৃত্তি পূরণ করবেই। একটার পর একটা চাইবেই।

নফস এরকম-ই। নফসকে আপনি কখনো পরিতৃপ্ত করতে পারবেন না। যত দিবেন, ততই তার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নফস কখনো বলবে না —আমার সমস্ত চাহিদা এবার পরিপূর্ণ হয়েছে; এখন আর আমার কিছুর প্রয়োজন নেই। এ- কথা সে কখনোই বলবে না, কেননা নফসের চাহিদা কখনো শেষ হয় না।

কোনো মানুষের সর্ব-চাহিদা এ- জীবনে কখনও পরিপূর্ণ হবে না। তাই, কেউ যদি ভাবে আমার নফস যা চায় তাই করবো, নফস যা বলবে তাই করবো, তবেই শান্তি পাবো—তাহলে তার ধারণা ভুল। নফসের চাহিদা পূরণ করে কখনো সে সুখের খোঁজ পাবে না। কেননা, নফসের বৈশিষ্ট্য হলো এক চাহিদা পূরণ হওয়ার পর, অন্য চাহিদার দিকে মনোনিবেশ করা।

এজন্য, আপনি যদি মনে মনে নফসের গোলামী করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে সারা জীবন তার গোলামী-ই করতে হবে। কারণ, সে সব সময় শুধু চাই চাই করবে, আর আপনাকে সর্বদা দিতেই হবে। দিতে দিতেই পুরো জীবন শেষ হয়ে যাবে; সুখের সাথে আর সাক্ষাৎ হবে না। সফলতার মুখ আর দেখতে হবে না। ইতি টানতে হবে সমস্ত সুখের গল্পে।

নফস হলো ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। নফস কখনো তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না—যদি তা আম্মারাহ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাকে যতই দিবেন, ততই খাবে। যতই পান করাবেন,ততই পান করবে। যতই ভোগ করতে দিবেন, ততই সে ভোগ করবে; তবু তার তৃষ্ণা, তার ক্ষুধা, তার চাহিদা নিবারণ হবে না। তার কাছে শত পাওয়াও, না-পাওয়ার মতো।

এজন্যই, রাসুল সা. বলেছেন, 'কখনো প্রবৃত্তির পিছনে ছুটো না, কখনো নফসের অনুসরণ করো না। কেননা নফস তোমাকে ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দিবে।' এজন্য আমাদের উচিত নফসকে নিয়ন্ত্রণ রাখা। তার চাহিদার ভ্রুক্ষেপ না করা।

দুই

আজকাল শোনা যায়—অমুকের মেয়েলি সমস্যা রয়েছে। আসলে এটা কী? মেয়েলি সমস্যা বলতে কী বুঝানো হয়েছে? বিষয়টা অনেকের কাছে পরিষ্কার, আবার অনেকের কাছে ঘোলাটে। এটা সত্যি, আজকাল অনেকের মধ্যেই মেয়েলি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এখন জানার বিষয় হচ্ছে, মেয়েলি সমস্যা কী?

মেয়েলি সমস্যা হচ্ছে, একজন যুবক মেয়েদের সাথে মিশতে মিশতে তাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে মেয়ে ছাড়া কিছুই বুঝে না। এক মেয়ে থেকে আরেক মেয়ে—এভাবে শুধু মেয়েদের পিছনেই ছুটতে থাকে। নিত্য নতুন মেয়েদের সাথে সম্পর্কে জড়ানো তার নেশায় পরিণত হয়। একদিন এই ঘাটে, আরেকদিন ওই ঘাটে। একদিন এই নায়ে, অপরদিন ওই নায়ে—একের মধ্যে সে সীমাবদ্ধ থাকে না। হরেক রকম

মেয়েদের সাথে মিশতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তার চিন্তা-চেতনায় শুধু মেয়েরাই ঘুরে। কীভাবে একটি মেয়েকে দ্রুত পটানো যায়, কীভাবে তাকে বশে আনা যায়—সে ভাবনায় বিভোর।

এটা একজন যুবকের জন্য খুবই ক্ষতিকর বদঅভ্যাস! এটা খুবই ধ্বংসাত্মক আসক্তি। এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কষ্টকর! যারা এই মেয়েলি সমস্যায় পতিত হয়েছে, তারাই বুঝতে পারে—এটা কত বড় নেশা! একটা ছেলে বিয়ের আগে এই কর্মকান্ডে লিপ্ত, তার মানে এই নয়—বিয়ের পর সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। বিয়ের পর এটা আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। বিয়ের পর সে তার স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। পর নারীদের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। একাধিক মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। এতে করে সংসারে নেমে আসে, অশান্তির ঝড়! উক্ত ঝড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় প্রত্যাশিত সাজানো-গোছানো সংসার!

এই মেয়েলি সমস্যা নফসের তাড়নায়-ই হয়ে থাকে! একটি মেয়ের সাথে হারাম সম্পর্কে জড়ানোর পর, তাকে ভোগ করে অন্যত্র জাল ফেলে। একটি মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়ানোর পর, নফস তখন আরো মেয়েদের সাথে সম্পর্কে জড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমত নফস বলে,' মেয়েটার সাথে সম্পর্ক কর; এটাই ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট। আর লাগবে না।' কিন্তু কিছুদিন পর ঠিকই অন্য মেয়ের প্রতি আসক্ত করতে বাধ্য করে।

নফস প্রথমত এভাবেই ধোঁকা দেয়। একটি মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়ানোর পর, পরবর্তীতে আরো মেয়েদের সাথে সম্পর্কে জড়াতে বলে। আপনি যখন তার ধোঁকায় পরে একটি সম্পর্কে জড়িয়ে গেলেন, তখন সে অন্যত্র জাল বিছানোর জন্য প্রস্তুতি নেয়। তাই আমি বলি—নফসকে যত দিবেন সে ততই চাইবে। যদি মনে করেন এটাই ফার্স্ট, এটাই লাস্ট, তাহলে ভুল ভাবছেন।

শুধু মেয়েলি সমস্যা-ই না! যারা পর্ণ আসক্ত, যারা হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত—তাদের জিজ্ঞেস করুন, তারা কীভাবে আসক্ত হয়েছে। প্রথমত নফস এই বলে ধোঁকা দিয়েছে—'এইতো, একবার পর্ণ দেখে নে'। একবার দেখলে কিছুই হবে না।' নফসের এই কৃত পরামর্শ যখন কানে নিয়ে নিলেন,

তখনই আটকে গেলেন ধ্বংসের বেড়াজালে! একবার পর্ণ দেখার পর, নফস আবার বলে,'আরেকবার দেখে নে', কিচ্ছু হবে না।' আপনি তখন নফসের চাহিদা পূরণ করতে আবার দেখে নিলেন। ধীরে ধীরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। এভাবে প্রতিনিয়ত সে আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে। প্রতিদিন এই বলে ধোকা দিচ্ছে—'আজ-ই শেষ দিন, আর কখনো দেখবো না।'

ঠিক হস্তমৈথুনের বেলায়-ও একই কথা। প্রথমত নফস বলে,'আজ-ই ফার্স্ট, আজ-ই লাস্ট; আর কখনো হস্তমৈথুন করতে হবে না।' নফসের এই কৃত পরামর্শ যখন কানে নিয়ে নিলেন, তখন সে আপনাকে দিয়ে প্রতিনিয়ত হস্তমৈথুন করালো। এখন নফস বলে,'আজ-ই শেষ দিন; আর কখনো হস্তমৈথুন করবো না। কিন্তু পরক্ষণেই এই কথা ভুলে গিয়ে আপনি আবার হস্তমৈথুনে অগ্রসর হন।

নফস এরকমই! তাকে আপনি যতই দিবেন, ততই চাইবে। সে কখনো নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একজন মানুষকে সকল অপকর্মে আসক্ত করার পিছনে মূল হচ্ছে এই নফস। নফস কোনো একটি অপকর্ম আপনাকে দিয়ে সম্পাদন করতে চাইলে আপনি যদি তার ধোঁকায় পরে উক্ত অপকর্ম করে ফেলেনে, তখন প্রতিনিয়ত আপনাকে দিয়ে সে ঐ কাজটাই করাবে। একপর্যায়ে তা নেশায় পরিনত হয়ে যাবে। মনে রাখবেন—ধোঁকা দিতে নফসের সবচে বড় হাতিয়ার হলো,' আজ-ই ফার্স্ট, আজ-ই লাস্ট।'

"আজ-ই ফার্স্ট, আজ-ই লাস্ট। আজকেই শেষ বার। কাল থেকে ভালো হয়ে যাব। একদম কোমর বেঁধে নামব। আর পাপ কাজে জড়াব না। আর কোনো দিন নামাজ কাজা করব না"—এই কথাগুলো যদি আপনার মাঝে স্থান করে নেয়, তাহলে কালবিলম্ব না-করে দ্রুত নফসের চিকিৎসা করুন। কেননা, এগুলো শ্রেফ নফস আর শয়তানের ধোঁকা। এই ধোঁকায় পড়ে থাকলে কখনো গোনাহের রাজ্য থেকে ফিরে আসা হবে না। কাল কাল করতে করতেই বেজে যাবে পরকালের ঘন্টা—ফেরা আর হবে না। ফিরবো ফিরবো বলে ফিরে যেতে হবে, সৃষ্টির উপাদান সেই মাটিতেই।

নফস ঠিক তো, সব ঠিক

এক

একটি গাড়ি। তার রয়েছে বিভিন্ন পার্টস। সাথে থাকে তার মূল ইঞ্জিন—যা ছাড়া পুরো গাড়িটাই অস্তিত্বহীন। ইঞ্জিনের উপর নির্ভরশীল গাড়ির পুরোটা বডি। অপরদিকে পুরো গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ করে একজন ড্রাইভার। ড্রাইভার যে-ভাবে চালাবে গাড়িটাও সেভাবেই চলবে। সে যদি আস্তে চালায়, গাড়িটাও আস্তেই চলবে। সে যদি জোরে চালায়, গাড়িটাও জোরে চলবে। সে চাইলে গাড়িতে হালাল পণ্য বহন করতে পারে, আবার হারাম পণ্য-ও বহন করতে পারে। চাইলে ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারে, আবার খারাপ কাজেও ব্যবহার করতে পারে। মোটকথা, পুরো গাড়িটাই ঐ ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণে।

ঠিক আমরাও ঐ গাড়ি'র মতোই। গাড়ি'র যেমন বডি রয়েছে, ঠিক আমাদেরও রয়েছে এক মানব দেহ। গাড়ি'র যেমন ইঞ্জিন রয়েছে, ঠিক আমাদেরও একটি ইঞ্জিন রয়েছে। গাড়ি'র যেমন চালক রয়েছে, ঠিক আমাদেরও রয়েছে কোনো এক নিয়ন্ত্রক। আমরা দেহবিশিষ্ট একজন মানুষ। আমাদের মূল ইঞ্জিন হচ্ছে, রুহ। আর আমাদের পুরো দেহের নিয়ন্ত্রক (চালক) হচ্ছে, 'নফস'। অর্থাৎ, আমাদের শরীরের ড্রাইভার হচ্ছে, নফস। যেমনি-ভাবে একজন ড্রাইভার পুরো গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি নফস আমাদের পুরো দেহটা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই, নফস যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই আমাদের চালানোর চেষ্টা করে। এজন্য, আমাদের উচিত আমাদের ড্রাইভারকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া। গাড়ির ড্রাইভারকে যদি ঠিকঠাক প্রশিক্ষণ দেয়া না-হয়, তাহলে যেমনি-ভাবে অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে; ঠিক তদ্রুপ, আমাদের নফসকে যদি আমরা ঠিকঠাক প্রশিক্ষণ না দিই, তাহলে আমাদের জীবনেও এক্সিডেন্টের আশঙ্কা সুনিশ্চিত।

একজন মাতাল ড্রাইভার যেমনি-ভাবে তার গাড়ির জন্য আশঙ্কাজনক, তদ্রুপ নফসে আম্মারাও আমাদের জন্য খুবই আশঙ্কাজনক। একজন মাতাল ড্রাইভার সবসময় চাইবে তার গাড়িটাকে ব্যবহার করে হারাম পন্য বহন করতে, তদ্রুপ আমাদের নফসে আম্মারাও সবসময় চায়, আমাদের ব্যবহার করে খারাপ কাজ সম্পাদিত করতে। তাই, সর্বপ্রথম আমাদের নফসকে এসলাহ করতে হবে। ড্রাইভারকে ঠিক না করলে যেমনিভাবে গাড়িটি নিরাপদ নয়, তেমনি আমাদের নফসকে এসলাহ না করা অবধি আমরা নিজেরাও নিরাপদ নই।

কে না চায় নিরাপদে থাকতে! সবাই চায় নিরাপদে থাকতে। এজন্য, সবাই যানবাহন ব্যবহার করার পূর্বে দেখে নেয়, ড্রাইভার ঠিকঠাক কি-না! সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কি-না! তাইতো দেখা যায়, প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন চেকপোষ্টে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে পরীক্ষা করা হয়। দেখা হয়—ড্রাইভার নেশা-টেশা করেছে কি-না। যদি সে নেশাগ্রস্ত হয়, তখন সেখানেই তাকে আটকে দিয়ে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়। কেননা, একজন ড্রাইভার পুরো গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ করে। এখন ড্রাইভার যদি হয় মাতাল, তখন গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারানোর সমূহ সম্ভাবনা তো থেকেই যায়।

এটা আমরা সবাই বুঝি এবং মানি। এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করি। কিন্তু আফসোসের বিষয়—আমাদের জীবনের প্রধান ড্রাইভার 'নফসের' ব্যাপারে খুবই উদাসীন! আমাদের সব কিছুর নিয়ন্ত্রক যে মাতাল হয়ে পড়ে আছে—সেদিকে কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করার জন্য এই নফস-ই যথেষ্ট!

তাই, সর্বপ্রথম আমাদের নফসকে এসলাহ করতে হবে। নফসকে ঠিক করতে হবে। নফস ঠিক তো, সবই ঠিক! নফস ঠিক নয়, কোনো কিছুই ঠিক নয়!

দুই

আমরা ইতিপূর্বে জানতে পারলাম—নফস ঠিক তো সব ঠিক। নফসের বেড়াজাল থেকে মুক্তির জন্য অবশ্যই তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নফস মাতাল হয়ে যেন আমাদের জন্য আশঙ্কাজনক না-হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। এজন্য যত কষ্টই হোক, নফসের বিরুদ্ধে যেতেই হবে। নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অসুস্থ নফসকে আবার সুস্থ করে তুলতে হবে। যখন নফস চাইবে—একটু টিভি দেখি, খারাপ খারাপ সিন দেখি, তখন নফসকে বারণ করে রাখতে হবে। তার চাহিদার মূল্যায়ন না করে, তার বিপরীত করতে হবে; যদিও তার কষ্ট হয়।

সূচনাকালে কষ্ট কিছুটা হবেই। কেননা, টিভি দেখা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আর অভ্যাস হুট করে স্বাভাবিক হয় না। হুট করে অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। তাই, যতক্ষণ না টিভি দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত নফসের শান্তি আসবে না; হা-হুতাশ করতে থাকবে, অস্বস্তি বোধ করতে থাকবে। নফস যতই কষ্ট পাক, যতই হা-হুতাশ করুক, থমকে গেলে চলবে না। নফসের হা-হুতাশ, নফসের অস্বস্তি দেখে নফসের চাহিদার গুরুত্ব দিলেই আপনি শেষ।

নফস, একটি দুর্বল সিংহ। যখন আপনি এর বিরোধিতা করবেন; তখন সিংহ নামক নফস, বিড়ালে পরিনত হবে। তাই, আপনার প্রচেষ্টা থেমে গেলে চলবে না ! চেষ্টার সর্বোচ্চ স্তর তার উপর প্রয়োগ করুন। ইনশাআল্লাহ, নফস ধীরে ধীরে তার ফিতরাতে প্রত্যাবর্তন করবে।

নফস হলো দুধ পান করা বাচ্চার মত। একজন মায়ের কাছে তার সন্তান কতোটা প্রিয়, তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর সাধারণত মায়ের বুকের দুধ পান করে। আর পান করাটা একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। সবকিছুর একটা নির্ধারিত সময় থাকে,

তেমনি দুধপানেরও একটি নির্ধারিত সময়ে রয়েছে। যখন সে নির্ধারিত সময় এসে যায়, তখন মা তার বাচ্চাকে দুধ ছাড়ানোর চেষ্টায় নিয়োজিত হয়।

মা যখন বাচ্চাকে দুধ ছাড়াতে যায়, বাচ্চা তখন হাউ-মাউ করে কাঁদতে শুরু করে। চিৎকার করতে থাকে। মা জানে, দুধ ছাড়তে বাচ্চার কষ্ট হবে, দুধ ছাড়াতে গেলে সে কান্না করবে, চিৎকার চেঁচামেচি করবে, নিজে ঘুমাবে না, তাকেও ঘুমাতে দিবেনা— তবু সে দুধ ছাড়ানোর চেষ্টা করে। তার যতই কষ্ট হোক, সে যতই চেঁচামেচি করুক, যতই কষ্ট দিক—তবু তার দুধ ছাড়াবেই। কারণ, সে জানে, এতেই তার কল্যাণ নিহিত। মা জানে, এখন যদি তার দুধ না-ছাড়ানো হয়, তবে সে ভাত-রুটি খাওয়ার উপযুক্ত হবে না। এজন্য, তাকে দুধ ছাড়ানো লাগবেই।

ধরে নিন, নফস হচ্ছে দুধ বাচ্চা। আর আপনি হলেন তার মা। আপনি দেখছেন সে যদি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে তবেই মঙ্গল। এজন্য যত কষ্টই হোক, সেটাই করতে হবে, যা তার জন্য কল্যাণকর।

কষ্ট হবে ভেবে নফসকে যদি তার চাহিদা অনুপাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন এর ফলাফল ভয়াবহ হবে, এটা সুনিশ্চিত। এক ব্যক্তির নজরে সমস্যা, মেয়েদের দিকে না তাকালে শান্তি মিলে না। এক ব্যক্তি সুদি কারবারের অভ্যস্ত, কারো মিথ্যা বলার অভ্যাস, কারো গীবত করার অভ্যাস, কারো পর্ণ দেখার অভ্যাস—এখন যদি তাকে এ- সমস্ত কাজ থেকে দূরে রাখা হয়, তখন সে কষ্ট পাবে—এটাই স্বাভাবিক। সবকিছু বাস্তবায়ন করে নফস। এখন যদি তার কর্মে বাধা দেয়া হয়, তখন কিঞ্চিৎ ব্যথিত তো হবেই। এখন যদি নফসের কষ্টের কথা ভেবে তাকে সকল কৃত কর্মে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে কোনো দিন অপকর্ম থেকে সে বের হয়ে আসতে পারবে না। আজীবন পাপের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে হবে। এজন্য, পাপ কাজ থেকে বের হয়ে আসার জন্য নফসের বিরুদ্ধে যাওয়াটা অতিব প্রয়োজনীয়। যত কষ্টই হোক, নফসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। যত কষ্টই হোক, তার বিরোধিতা করতেই হবে। আবারো বলছি, 'নফস ঠিক তো, সব ঠিক'।

নফসের গোলামী করাও এক প্রকার শিরক

শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম, যা থেকে মুক্ত থাকা অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় বারবার শিরক করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আল্লাহ্ তাআলা সকল গোনাহ্ মাফ করলেও শিরকের গোনাহ্ কখনো মাফ করবেন না। যারা শিরক করবে, তাদের শাস্তিও মারাত্মক। আসুন জেনে নিই, শিরকের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কী বলেন...

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব, যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।[৪]

শিরক মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। শিরক এক ভয়াবহ গোনাহ! শিরক থেকে বেঁচে থাকতে রাসুল সা. বারংবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু তবু আজকাল আমরা শিরকে লিপ্ত হয়ে যাই। জেনে অথবা না-জেনে; বুঝে অথবা না-বুঝে—বিভিন্ন সময় শিরকের মতো জঘন্য পাপ করে বসি।

যাহোক, আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, নফস! এখানে শিরকের কথা এজন্য নিয়ে এসেছি—নফসের গোলামী করাও এক ধরনের শিরক। কুরআনে, আল্লাহ্ পাক বলেন...

আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার কুপ্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে?[৫]

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়—কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা, তার গোলামী করাও এক ধরণের শিরক। আর এটা এভাবে যে—

---

[৪] সূরা নিসা, আয়াত- ৪৮

[৫] সূরা জাসিয়া, আয়াত- ২৩

১. আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হচ্ছে واقيموا الصلاه : তোমরা নামায কায়েম করো। আর নফস বলে: নামাজ রেখে খেলতে যা।

২. আল্লাহ তাআলার নির্দেশ : واتوا الزكاه তোমরা যাকাত প্রদান করো। আর নফস বলে: যাকাত দিস না; মাল কমে যাবে।

৩. আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ: وتصوم رمضان তোমরা রমজান মাসের রোজা রাখো। আর নফস বলে: রোজা রাখলে শুকিয়ে যাবি, তোর কষ্ট হবে।

৪. আল্লাহ তাআলার নির্দেশ : وتحج البيت : তোমরা বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্ব করো। আর নফস বলে: আরে, এত কষ্ট করার কী দরকার? কষ্ট করার দরকার নেই; হজ্ব করারও দরকার নেই!

৫. আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ: لا تقربوا الزنا : তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। আর নফস বলে: মেয়েদের পিছনে ছোটতে হবে, তাদের সাথে হারাম সম্পর্কে জড়াতে হবে। ভোগ করতে হবে, নিজের যৌন চাহিদা মেটাতে হবে।

লক্ষ্য করে দেখুন—নফসে আম্মারা বিস-সো, আল্লাহ্ তাআলার বিপরীত হুকুম প্রদান করছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক সৎকাজের আদেশ প্রদান করছেন, আর নফস সেখানে বিপরীত নির্দেশ দিচ্ছে। নফস প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের বিরোধিতা করছে।

এ কারণেই তো আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন: "আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার কুপ্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়েছে"। এ আয়াতকে সামনে রেখে অনেক বড় বড় স্কলারগন বলেছেন—নফসের গোলামী করাও শিরক!

নফস আপনাকে আদেশ করছে, আর আপনি আমি তা বাস্তবায়ন করছি। এখন আপনি যদি নফসের হুকুম মান্য করে চলেন, তার চাহিদার মূল্যায়ন

করেন, তবে এটা হবে নফসের গোলামী। আর যদি আল্লাহ্ তাআলার হুকুম মান্য করেন, তখন এটা হবে আল্লাহ্ তাআলার গোলামী। এখন আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন—আপনি কার গোলামী করছেন? নফসের নাকি স্বীয় রবের? আল্লাহ্ তাআলা বলেন—তোমরা নামায আদায় করো। আর নফস বলে, শীতের সকাল, ঘুম থেকে ওঠার দরকার নেই; আরেকটু ঘুমা, মজা পাবি। তখন আপনি যদি নফসের হুকুম উপেক্ষা করে, আরামের নিদ্রা ত্যাগ করে, নামাজে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন, তবে সেটা হবে আল্লাহ'র গোলামী। আর যদি নফসের কথামতো কম্বল টানা দিয়ে শুয়ে পড়েন, তখন সেটা হবে নফসের গোলামী।

আপনি যদি সর্বদা নফসের হুকুম মানতে শুরু করে দেন, তখন সেটা তার গোলামীর পরিচয় বহন করবে। শরীয়তের যত বিধি-বিধান রয়েছে, তা পালন করা আমাদের উপর আবশ্যক। আর আমরা তা পালন করার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করি। যখন আপনি আমি ওই বিধি-বিধান পালন করতে যাই, তখন সেখানে নফস এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে বিপরীত হুকুম প্রদান করে। তখন আপনি আমি যদি তার হুকুম মান্য করে তার ফাঁদে পা দিয়ে দিই, তখন সেটা হবে তার গোলামী। আর আমরা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি, নফসের গোলামী করাটাও এক ধরনের শিরক।

তাই, আমাদের উচিত নফসের গোলামী ত্যাগ করে এই শিরক থেকে বেঁচে থাকা। নফস যখন বলবে— নামাজ পড়ার দরকার নেই, ঘুমিয়ে থাক। তখন আপনি বলবেন, হে নফস! আমি তোর বান্দা নই, আর তুইও আমার রব না। আমি তোর হুকুম মানতে বাধ্য নই। আমার আল্লাহ্ বলেছেন নামাজ পড়তে, এখন আমার যত কষ্টই হোক, যত ঠান্ডাই লাগুক, আমি অবশ্যই আমার রবের হুকুম মানতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। তুই আমার রব না; আমিও তোর বান্দা না, সুতরাং আমি তোর হুকুম মানতে বাধ্য নই।

সর্বোপরি একটা কথাই বলবো—নফসের গোলামী করে শিরক -এর মতো জঘন্য পাপে আমরা যেন জড়িয়ে না যাই।

মোকাবেলা

কারাবন্দী দু'জন অপরাধী কখনো একজন আরেকজনের জামিন হতে পারে না। কেননা, দুজনই কারাবন্দি। বন্দিশালায় অবস্থান করে একজন আরেকজনের জামিন হওয়া দুষ্কর ব্যাপার। এজন্য, জামিন হতে হলে বাইরের কাউকে প্রয়োজন হবে; মুক্ত-স্বাধীন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হবে, যে-কিনা জামিন হয়ে তাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করবে। একজন অপরাধী যেমনি-ভাবে আরেকজন অপরাধীকে কারামুক্ত করতে পারে না, ঠিক তদ্রুপ নিজের ভিতরে নফসে আম্মারাকে লালন করে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করা যাবে না; তার বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করা যাবে না। লাগামহীন নফসকে নিজের মধ্যে পুষে কখনো নিজেকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে না। কেননা, সে নিজেই অপরাধী, সে নিজেই পাপের দিকে আমাদের ধাবিত করে।

তো যেটা বলছিলাম—আমরা যদি নিজেদের মধ্যে শুধুমাত্র আম্মারার গুণাবলী লালন করি, তখন এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর হবে। কারণ, সে নিজেই অপরাধী। তাই, আমাদের উচিত ভালো একজন প্রতিপক্ষ তার সামনে দাঁড় করানো। একজন অপরাধীকে কারামুক্ত করার জন্য যেমনি-ভাবে একজন ভালো উকিলের প্রয়োজন হয়, তেমনি আমাদের নফসে আম্মারা'র বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হলে আম্মারা'র সম্মুখে একজন ভালো প্রতিপক্ষ দাঁড় করাতে হবে। আর সে প্রতিপক্ষ হচ্ছে নফসে মুত্বমায়িন্নাহ। যখন আপনি আম্মারা'র সামনে মুত্বমায়িন্নাকে দাঁড় করিয়ে দিবেন, তখন একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আম্মারা'র প্রতিপক্ষ মুত্বমায়িন্নাহ আর মুত্বমায়িন্নার প্রতিপক্ষ হচ্ছে আম্মারা। প্রতিপক্ষ তখনই দাঁড় করাতে পারবেন, যখন নিজের মধ্যে মুত্বমায়িন্নাকে নিজের মধ্যে লালন করতে পারবেন। মুত্বমায়িন্নাকে লালন করতে পারলেই সে তখন আম্মারা'র সাথে মোকাবেলা করতে পারবে।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত, উত্তম পরিকল্পনা ও কঠোর শ্রম -এর প্রয়োজন হয়—তবেই উক্ত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া যায়। তো, নফসে আম্মারা এবং নফসে মুত্বমায়িন্নাহ -এর প্রতিযোগিতাও এরকমই হবে। আপনি আমি অবশ্যই চাইবো নফসে আম্মারা'র উপর নফসে মুত্বমাইয়িন্নাহ বিজয়ী হোক। তাই, যেহেতু আমাদের লক্ষ্য বিজয়ী হওয়া, সেহেতু সঠিক সিদ্ধান্ত, উত্তম পরিকল্পনা, এবং কঠোর শ্রম তো দিতেই হবে।

যেহেতু নফসে আম্মারা শুধুমাত্র আমাদের ক্ষতি সাধন করে, সেহেতু তার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতঃপর, কীভাবে নফসে আম্মারা'র কার্যাবলী উৎখাত করা যায়, সেজন্য উত্তম পরিকল্পনা করতে হবে। অতঃপর, কিছু দুঃখ কষ্ট বহন করে, সেভাবেই নফসে আম্মারা'র বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে।

সাধারণত যখন আম্মারা আপনাকে আমাকে খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করতে চায়, তখন মুত্বমায়িন্না এসে বাধা প্রদান করে। আম্মারা বলে যা সিনেমা দেখে আয়; মজা পাবি। তখন মুত্বমায়িন্নাহ বলে, না! যাস না, এটা খুবই গর্হিত একটি কাজ, এই কাজের দরুন তোকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। ঠিক তেমনি-ভাবে মুত্বমায়িন্নাহ যখন নামাজ পড়ার তাগিদ দেয়, তখন আম্মারা এসে বলে, আরে, এত আরামের ঘুম রেখে নামাজ পড়ার কী দরকার? নামাজ পড়তে হবে না, ঘুমিয়ে থাক।

এটাই হচ্ছে মুত্বমায়িন্নাহ এবং আম্মারা'র মোকাবেলা। যাকে বলা হয়—কারাবন্দি এবং মুক্ত স্বাধীনের মোকাবেলা। এ মোকাবেলায় সে-ই বিজয়ী হবে, যে প্রতিপক্ষ হিসেবে মজবুত। এজন্য, আপনি আমি যদি নফসে আম্মারা'র উপর, নফসে মুত্বমায়িন্নাকে বিজয়ী করতে চাই, তবে নফসে মুত্বমায়িন্নাকে সেরকম মজবুত করেই রাখতে হবে। যদি সে দুর্বল হয়, তবে সে আম্মারা'র কাছে পরাজিত হয়ে যাবে। তখন আম্মারা আপনাকে আমাকে ব্যবহার করে শুধু খারাপ কাজই করাবে। তবে, মুত্বমায়িন্নাকে যদি মজবুত ভাবে তার সামনে দাঁড় করানো যায়, তখন সে পরাজয় বহন

করতে বাধ্য। এজন্য আম্মারা'র বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হলে, আমাদের সর্বপ্রথম মুত্বমায়িন্নাকে মজবুত করতে হবে। অতঃপর আম্মারা'র সামনে তাকে দাঁড় করাতে হবে।

একটা কথা না-বললেই নয়—মানুষের ফিতরাত হচ্ছে, প্রশান্ত আত্মা (ভালো নফস)। সুতরাং, নফসে মুত্বমায়িন্নাহ সবার মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু, নফসের ওপর লাগাম না থাকায়, তার ব্যাপারে উদাসীন থাকায়, নফস তার ফিতরাতের গন্ডি পেরিয়ে আম্মারায় পরিণত হয়ে যায়।

নফসের খোরাক, রুহের খোরাক

যখনই আমাদের গোনাহ -এর পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তখন নফস ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয় বটে, তবে আমাদের রুহ দুর্বল হয়ে পড়ে। গোনাহের কারণে রুহ তার সজীবতা হারিয়ে ফেলে। রুহ অসুস্থ হয়ে পড়ে— যাকে আমরা রুহানি বেমার বলে থাকি। রুহানি বেমার এমনি এমনি হয় না; তা গোনাহের কারণেই হয়ে থাকে।

নফসের প্রধান হাতিয়ার হলো, শরীর। শরীর আর রুহ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন: যে-সব কাজের দ্বারা শরীর দুর্বল হয়ে যায়, সে-সব কাজের দ্বারা রুহ শক্তিশালী হয়। আর যে-সব কাজের দ্বারা রুহ শক্তিশালী হয়, সে-সব কাজের দ্বারা শরীর দুর্বল হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—সাধারণত রোজা রাখলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু রোজার দ্বারা আমাদের রুহ শক্তিশালী হয়। অন্যদিকে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও বেশি খাবারের দ্বারা আমাদের শরীর শক্তিশালী হয়, কিন্তু বেশি খাবারের দ্বারা রুহ দুর্বল হয়ে পড়ে।

আমরা নফসের ক্ষুধা ঠিকই নিবারণ করছি; রুহের ক্ষুধা নয়। নফসকে নিয়মিত খাবার দিচ্ছি; কিন্তু রুহকে নয়। এতে করে দিন দিন নফস সবল হয়ে যাচ্ছে; অপরদিকে রুহ দুর্বল হয়ে পড়ছে। খাবারের অভাবে একজন সুস্থ সবল মানুষ যেমনি-ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি রুহের খাবারের ব্যবস্থা না করলে, রুহও দুর্বল হয়ে পড়ে।

নফসের খাবার হচ্ছে—শাহওয়াতে নফসানিয়্যাহ (মনের কুপবৃত্তি) খারাপ কাজ। অপরদিকে রুহের খাবার হচ্ছে—নেক কাজ। আপনি যত বেশি নেক কাজ করবেন, রুহ তত বেশি সতেজ হয়ে উঠবে। অপরদিকে, আপনি যত বেশি বদকাজ করবেন, নফস ততবেশি সতেজ হয়ে উঠবে। আর নফস সতেজ হলে তার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করা, খুবই কষ্টকর।

রুহকে সতেজ করতে হলে আমাদেরকে বেশি বেশি জিকির করতে হবে। কেননা, জিকির হলো রুহের খোরাক। পক্ষান্তরে, নফসকে দমিয়ে রাখার জন্য আমাদেরকে বেশি বেশি রোজা রাখতে হবে। কেননা, রোজা নফসকে দূর্বল করতে অগাধ ভূমিকা রাখে। তাই, আমাদের উচিত সবসময় রুহকে সতেজ রাখা। আর রুহকে সতেজ রাখতে হলে বেশি বেশি নেক কাজ তো করতেই হবে। যখন আপনার রুহ পরিপূর্ণভাবে সতেজ হয়ে যাবে, তখন সেখানে নফস, তার নেতৃত্ব হারাবে। নফস কখনোই আপনার মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আর নফস যখন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, তখন বদকাজের চিন্তা-ভাবনা এমনি দূরিভূত হয়ে যাবে।

নফসের হাতিয়ার

নফস মানুষের দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত নয়; তার রয়েছে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সাধারণত, আমাদের দেহে যতগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, তার প্রত্যেকটি নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আর তাদের ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করছে, নফস। নফসের রয়েছে অনুভূতি শক্তি, সে সব কিছু অনুভব করতে পারে। তার রয়েছে কল্পনা শক্তি, সে সব কিছু কল্পনা করতে পারে। তার রয়েছে যে-কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি। সেই সুবাদে সে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে থাকে। যেমন: নফস যখন লাগামহীন হয়ে যায়, তখন সে সিদ্ধান্ত নেয় চুরি করবে, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করণার্থে তখন দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে থাকে। এটা এভাবে যে—চুরি করার জন্য অবশ্যই তাকে ওই স্থানে যেতে হবে—যেখানে সে চুরি করবে। এজন্য তাঁকে হেঁটে হেঁটে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। এক্ষেত্রে প্রথমত সে 'পা' -কে ব্যবহার করে। অতঃপর রাস্তা চিনে যাওয়ার জন্য 'চোখ' -কে ব্যবহার করে। এমনি-ভাবে হাত -সহ আরো কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে সে তার কৃত-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

মোটকথা, নফস হলো রাজা, আর দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে তার সিপাহী। নফস হচ্ছে মালিক, আর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে তার শ্রমিক। মালিক যা আদেশ করে শ্রমিক তা-ই করে। শ্রমিক আদেশ পাওয়ার পর ভেবে দেখে না—কোনটা তার মালিকের জন্য ভালো, আর কোনটা খারাপ। আদেশ পাওয়ার পর সাথে সাথে তা বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, আমাদের দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো ধরনের অনুভূতি শক্তি নেই। নেই কোনো সিদ্ধান্তের শক্তি। অনুভূতি শক্তি তো নফসের এক সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। নফস তার অনুভূতি শক্তি কাজে লাগিয়ে যে-

কোনো সিদ্ধান্তে স্থির হয়। অতঃপর তা বাস্তবায়নে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে।

তাই আমাদের শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে-কোনো কাজ করার আগে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। যাতে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কোনো গোনাহের কাজ সম্পন্ন না হয়।

আমাদের শরীরের এমন কতক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যাদের বদৌলতে নফস, তার হীন চরিতার্থ বাস্তবায়ন করে। যাদের সাহায্যে খুব সহজেই তার মনোবৃত্তি পূরণ করে।

ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা যায়, 'নফসের হাতিয়ার'। নফসের অনেকগুলো হাতিয়ার রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, চোখ।

নফসের সবচে বড় হাতিয়ার হচ্ছে চোখ। নফস চোখকে ব্যবহার করে তার মনোবৃত্তি পূরণ করছে।

নজর হচ্ছে শয়তান এবং নফসের তীর। এর দ্বারা তারা শিকার করে বনি আদমকে। বরবাদ করে বনি আদমের ঈমান ও আমল। ফাঁসিয়ে দেয় পাপের চোরাবালিতে। ডুবিয়ে দেয় পাপের বিষাক্ত সাগরে। নফসের কাছে নজর নামক এই তীর, বনি আদমকে শিকার করার সবচে সহজ অস্ত্র। মানুষ ভাবে, একটু নজরই তো! ব্যস! কিন্তু কখনো কখনো এক নজরেই কুপোকাত হয়ে যায় মানুষের হৃদয়-মন।

কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতরাজি সম্পর্কে আপনাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন আপনার আমার উত্তর কী হবে? যখন জিজ্ঞেস করবেন,'আমি তোকে চক্ষু দিয়েছিলাম, তুই তা কোন কাজে ব্যবহার করেছিস?' তখন আপনার আমার উত্তর কী হবে? আমরা কি তা সঠিক পন্থায় ব্যবহার করছি? আমরা কি তার শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা কি চোখকে হেফাজত করছি?

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় কান, চোখ, হৃদয় এর প্রতিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (১)[৬]

আমাদের সবসময় এ- ভয় করা উচিত—আমি যদি এ চোখ দিয়ে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করি, হারাম জিনিস দেখি, আর আল্লাহ তাআলা আমার এ চোখ অন্ধ করে দেন; ছিনিয়ে নেন দৃষ্টিশক্তি!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আমি চাইলে তাদের চোখ (দৃষ্টিশক্তি) লোপ করে দিতাম। তখন তারা পথ চলতে চাইলে কীভাবে দেখতে পেত!'[৭]

সুতরাং, বেশি বেশি দু'আ করা উচিত, হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা কর চোখের যাবতীয় গুনাহ থেকে; সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ থেকে।

আমরা পথ চলি, আর চোখকে চোর বানিয়ে এদিক-ওদিক দৃষ্টি প্রশারিত করি। বেগানা নারীদের দেখে নফসের চাহিদা পূরণ করি। আমরা ভাবি—কেউ আমাদের দেখছে না। অথচ, আল্লাহ তাআলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—"না বান্দা! কেউ দেখছে না; এমন নয়। তোমার সঙ্গে চলতে থাকা মানুষ যদিও দেখছে না; তবে তোমাকে যিনি এ চোখ দান করেছেন, তিনি কিন্তু ঠিক দেখছেন—সেটা মনে রাখা দরকার।

এ-ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

'তিনি (আল্লাহ) জানেন চোখের চোরাচাহনি এবং সেইসব বিষয়ও, যা বক্ষ-দেশে লুকায়িত।'[৮]

আমার চোখ। আমি যদি তা আল্লাহ'র হুকুম মত ব্যবহার না করি, হারাম জিনিস দেখি, তাহলে আমার চোখই কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে আমার নামে নালিশ করবে: হে আল্লাহ! সে আমার দ্বারা অমুক পাপ করেছে। অমুক হারাম বস্তুর দিকে তাকিয়েছে।

---

[৬] সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত – ৩৬

[৭] সূরা ইয়াসীন, আয়াত- ৬৬

[৮] সূরা মুমিন, আয়াত – ১৯

এ-ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের কান, তাদের চোখ, তাদের ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষী দিবে তাদের বিরুদ্ধে।'[১]

নফস শুধুমাত্র চোখকে ব্যবহার করে, তা কিন্তু নয়; শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ব্যবহার করে থাকে। যেমন: হাত, পা, কান, জবান ইত্যাদি। চোখের ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ থেকে কীভাবে বাঁচতে পারি, সে জন্য আমাদের সবসময় সচেষ্ট থাকতে হবে। পাশাপাশি কুরআন-হাদিসে বর্ণিত কার্যকরী কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে, আমরা চোখের গোনাহ সহ অন্যান্য গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকতে পারবো।

আসুন, নফসের প্ররোচনায় আমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা গোনাহ করার আগে এই কথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে নিই...

১. চোখ : চোখ দিয়ে মানুষ দেখে। দেখার ক্ষেত্রে ভালো ও খারাপ দু'টিই দেখার সুযোগ রয়েছে। তাই চোখ দিয়ে খারাপ কোনো কিছু দেখার আগে এই ভাবনা মানুষকে গোনাহ করা থেকে বিরত রাখতে পারে—এই চোখ-ই কেয়ামতের দিন এ-অন্যায়ের ব্যাপারে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

২. হাত : হাতের উপর নির্ভর করে সে বিভিন্ন খারাপ কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। হাত দিয়ে মানুষ কাজ করে। ভালো ও মন্দ উভয় কাজই হাত দ্বারা করা যায়। সুতরাং, হাত দিয়ে খারাপ কোনো কিছু করার আগে এই ভাবনা মানুষকে গোনাহ করা থেকে বিরত রাখতে পারে—এই হাত-ই কেয়ামতের দিন এ- অন্যায়ের ব্যাপারে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

৩. পা : নফস বিভিন্ন খারাপ কাজের জন্য এই পা'কে ব্যবহার করেই খারাপ কাজগুলো সম্পাদন করে। পা দিয়ে মানুষ চলাফেরা করে। ভালো ও মন্দ উভয় পথেই চলা সম্ভব। তাই, পা দিয়ে খারাপ কোনো কিছুর দিকে ধাবিত হওয়া বা কোনো খারাপ কাজ করার প্রতি এগিয়ে

[১] সূরা হা-মীম সিজদাহ,আয়াত- ২০

যাওয়ার সময় এই ভাবনা মানুষকে গোনাহ করা থেকে বিরত রাখতে পারে—এই পা-ই কেয়ামতের দিন এ- অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

৪. কান : এটা ব্যবহার করে গান-বাজনা, অশ্লীল কথাবার্তা, অন্যের সমালোচনা সহ বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজে নফস তাকে ব্যবহার করে থাকে।

কান দিয়ে শোনা যায়। মানুষ চাইলে ভালো কিছু শুনতে পারে, আবার খারাপ কথা কিংবা সংলাপও শুনতে পারে। তাই, কান দিয়ে যদি খারাপ কোনো কিছু শুনার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়, তবে এই ভাবনা মানুষকে গোনাহ করা থেকে বিরত রাখতে পারে—এই কান-ই কেয়ামতের দিন মন্দ কিছু শোনার দিকে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

৫. মুখ : এটা দ্বারা মিথ্যা বলা, গালাগালি করা, চোগলখোরী করা; অন্যের গীবত করা সহ আরো বিভিন্ন গোনাহ আঞ্জাম দিতে নফস এই মুখ'কে ব্যবহার করে থাকে। মুখ দিয়ে মানুষ কথা বলে। খাওয়া-দাওয়া করে। এ মুখ দ্বারা যে-সব অন্যায় কাজ সংঘটিত হবে, সে-সব কাজ সেদিন দৃশ্যমান হবে। নিজের বিরুদ্ধে কেয়ামতের ময়দানে সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং, মুখ দ্বারা কথা বলার সময়, খাওয়ার সময় এ- চিন্তাই মানুষকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে— 'মুখের কথা ও কাজ কেয়ামতের দিন নিজের বিরুদ্ধে দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।

সুতরাং, হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ ইত্যাদি অঙ্গের দ্বারা যে-কোনো কাজ করার আগে মানুষের জন্য এ- চিন্তা করা খুব বেশি প্রয়োজন— 'আমি যে কাজ করছি, কেয়ামতের দিন এসব অঙ্গই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে; কাজের বিবরণ দেবে। এ চিন্তা করলেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ।

নফসের চিকিৎসা করুন, নয়তো পচন ধরবে

নোংরা পচা জিনিসের দুর্গন্ধ আমরা সহ্য করতে পারি না, আমরা কখনো দুর্গন্ধের ধারে কাছেও যাই না। সব সময় নোংরা-পচা জিনিস থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। কেননা, নোংরা-পচা দুর্গন্ধময় জিনিস থেকে আমাদের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে যেতে পারে। এজন্য, অপারগ হয়ে কখনো যদি নোংরা-পচা জিনিসকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়, অথবা নিজের অজান্তে পচা দুর্গন্ধময় জিনিস আমাদের গায়ে লেগে যায়, তখন কোনো ধরনের কালবিলম্ব ছাড়াই, দ্রুত ওই জায়গা ধোয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। যতক্ষণ না ধৌত করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তি মিলে না। কারণ, নোংরা-পচা জিনিসই রোগজীবাণুর কারখানা। এটা যদি আমাদের গায়ে লেগে যায়, তখন ধৌত না করলে এটার প্রভাব আমাদের সারা শরীরে বিস্তার করবে। ফলে, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

বাহ্যিক পচা দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনা থেকে তো নিজেকে অনেকবার দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। কখনো কি নিজের দুর্গন্ধময় নফস থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন? না, আমরা কেউ করি না, আর এটা সম্ভবও নয়। কারণ, নফস আমাদের সাথেই রয়েছে। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব। তবে, নফসের ময়লা-আবর্জনা, দুর্গন্ধ দূর করার উপকরণ রয়েছে বহু। আমরা চেষ্টা করলেই পারব, নফসের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি, যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা দূর করে নিজেকে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ করতে।

এখন হয়তো আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—নফস আবার দুর্গন্ধময় হয় কীভাবে? আরে, নফস যখন এত বেশি গোনাহ করে, গোনাহ করতে করতে এক পর্যায়ে সে লাগামহীন হয়ে যায়, তখন তার কাছে কোনো গোনাহ আর গোনাহ মনে হয় না। কোনো পাপ আর তার দৃষ্টিতে পাপ মনে হয় না। সর্বদা খারাপ কাজ করেও সে অনুতপ্ত হয় না—তখন বুঝে নিবেন,

ঐ নফস অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে পাপ কাজ করতে করতে নিজেকে জখম করে ফেলেছে।

আমরা জানি, যে-কোনো অসুস্থ বস্তুর চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। তাই, আমাদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে গোনাহ হওয়ার পরও যখন গোনাহ মনে হয়নি, তখন উচিত ছিল, তাৎক্ষণিক চিকিৎসা করা। আত্মশুদ্ধি করে তার জখম দূর করা। কিন্তু, আমরা তা করিনি। তাকে তার মতো ছেড়ে দিয়েছি। ফলে, নফস ধীরে ধীরে তার সুস্থতা হারিয়ে অসুস্থ পথে হেঁটেছে। সে যে ফিতরাতে ছিলো, তা পরিবর্তন হয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

আচ্ছা, জখমের স্থান চিকিৎসা না করে এমনি এমনি ছেড়ে দিলে, কখনো কি জখম দূর হবে? নাকি উক্ত স্থানে পচন ধরে দিন দিন দুর্গন্ধ ছড়াবে? অবশ্যই দুর্গন্ধ ছড়াবে। আমরা যখন কোনো জখমের স্থান চিকিৎসা না করে এমনি এমনি রেখে দিই, তখন ধীরে ধীরে জখমের স্থানে পচন ধরে। আর যখন তাতে পচন ধরে, তখন তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

ঠিক আমাদের নফসের ক্ষেত্রে এরকমই। গোনাহের কাজ করলে নফস কখনো সতেজ হয় না; উল্টো তা অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যখন নফস অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন গোনাহের কাজ করলেও আর গোনাহ মনে হয় না। এরকমটা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তাই, যখন দেখবেন গোনাহ করার পরও আর গোনাহ মনে হচ্ছে না, তখন বুঝে নিবেন—নফস আক্রান্ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায়, তাৎক্ষণিক নফসের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে হবে। নয়তো, কিছু দিন পর তা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াবে; যদিও তা অনুভূত হবে না।

কে শেকলবন্দি—আমার কাছে নফস, নাকি নফসের কাছে আমি?

কতজন-ই তো বলে—আমি তাহাজ্জুদে উঠতে পারি না, তাহাজ্জুদে মন ফিরাতে পারি না। ফজরে উঠতে পারি না, জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে পারি না। যাকাত দিতে পারি না। সময়ে অসময়ে মিথ্যার আশ্রয় নিই। গীবত থেকে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারি না। পরনিন্দা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি না। বেগানা নারী থেকে নজর ফেরাতে পারি না। ভালো কিছু করতে গেলেই যেন, ভিতর থেকে এক ধরনের বাধা আসে। মনে হয় সৎ কাজ থেকে দূরে রাখতে, কেউ আমাকে শেকলবন্দি করেছে। মনে হয়—আমার আর নেক আমলের মধ্যে কেউ একজন দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এক-পা দু-পা করে এগিয়ে যাই—সৎ কাজের উদ্দেশ্যে! তখনই মনে হয়, পেছন থেকে কেউ আমার পা ধরে টানছে। ভেতর থেকে কেউ একজন তাকে সাহায্য করছে। ভেতর থেকে ক্রমাগত বাধা-বিপত্তি আসছে।

আমি অশ্লীল খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চাই! হারাম থেকে বেঁচে থাকতে চাই। গীবত ও পরনিন্দা থেকে নিজের জবানকে হেফাজত রাখতে চাই। নারীর ছলনা থেকে মুক্ত থাকতে চাই। যখনই এগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে সরে আসতে চাই, তখনই মনে হয়—কেউ একজন আমাকে জোর করে এগুলোর মধ্যে নিক্ষেপ করছে। মনে হয়, কেউ একজন পেছন থেকে তাড়াচ্ছে। ভেতর থেকে বারবার ফুসলিয়ে দিচ্ছে। বারবার মনে হয়—তার কাছে আমি পরাজিত। তার গোলামিতে সিদ্ধহস্ত। আমি জানতে চাই, কে সে? কে আমাকে এভাবে ঘোরাচ্ছে? আমি জানতে চাই, কে আমার কাছ থেকে জান্নাতের চাবি কেড়ে নিয়ে, জাহান্নামের তালা খুলছে? সে আর কেউ নয়; সে তো শয়তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাগামহীন নফস।

আজ নফস আপনাকে জোর করে পাপ কাজে ঠেলে দিচ্ছে। নফস আপনার জবান দিয়ে অশালীন কথাবার্তা বের করছে। নফস আপনাকে শেকলবন্দি করেছে। নফস আপনাকে সৎকাজ থেকে বিরত রাখছে। আর আপনি নফসের গোলামী করে তাকে মনিব বানিয়েছেন। ফলে সে আপনাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই ঘোরাচ্ছে। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করছে। আর আপনি তার দাসত্ব করেই যাচ্ছেন। উচিত ছিল, আপনি নফসকে শেকলবন্দি করবেন। কিন্তু উল্টো, সে আপনাকে শেকলবন্দি করেছে। যার কারণে, আপনি নামাজ থেকে দূরে; নেক কাজ থেকে বিরত। পাপ কাজে জড়িত; পাপের সাগরে ডুবন্ত।

যারা বলে, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারি না, ইবাদতে মন বসাতে পারি না, তারাই সেই লোক—যাদের শেকলবন্দি করেছে, নিজের মধ্যে লালন করা ভয়ংকর নফস। তাই, কেউ যদি নফসকে শেকলবন্দি না করে, উল্টো তার কাছে শেকলবন্দি হয়ে যায়, তখন সে আর পাপের সমুদ্র থেকে বের হতে পারে না।

নফসের ব্যাপারে সতর্ক হোন

নফসের ওপর কখনো আস্থা রাখবেন না। নফস খুবই ভয়ঙ্কর। যখন তখন আপনাকে ধোঁকায় ফেলে তার মনোবৃত্তি পূরণ করতে পারে। তাই, আশঙ্কাজনক কোনো ক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন। কেননা, নফস হচ্ছে ক্ষুধার্ত বিড়ালের ন্যায়। বিড়াল যেমনি-ভাবে দুধ দেখলেই তাতে মুখ দিয়ে দেয়, ঠিক তদ্রুপ নফস যদি আশঙ্কাজনক স্থানে থাকে তবে সেখানে কোনো কিছু ঘটাবেই। তাই, নিজেকে যথাসম্ভব আশঙ্কাজনক ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন। নয়তো নফসের তাড়নায় জড়িয়ে পড়তে পারেন, বড় কোনো অপরাধে।

হযরত ওমর রাযি. নিজের নফসকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি নফসকে অনেক বড় শত্রু মনে করতেন। নফস কখন কী করে বসে—এই ভেবে নিজেকে হেফাজত রাখার চেষ্টা করতেন।

একবার, হযরত ওমর রাযি. বাহিরে শুয়ে আছেন। শীতের মৌসুম। প্রচন্ড শীত। ওপরে কোন ছাউনি নেই। তবু তিনি কষ্ট করে বাহিরে শুয়ে আছেন। তখন একজন সাহাবী তাকে দেখতে পেলেন। হযরত ওমরকে বাহিরে শুয়ে থাকতে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন—একজন আমিরুল মু'মিনিন এই শীতের রাতে বাহিরে শুয়ে আছে! ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন ওমরের কাছে। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন,' হে আমিরুল মু'মিনিন! এই শীতে আপনি বাহিরে শুয়ে আছেন কেন?' তিনি জবাবে বললেন,' আমি আমার নফসকে অনেক ভয় করি। তার ওপর আমার মোটেও আস্থা নেই। সে আমার অনেক বড় শত্রু। নফসের প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য, আমি বাহিরে শুয়ে আছি। কারণ, হুযুর সা. -এর স্ত্রী, আমার কন্যা হাফসা আজ বাড়িতে এসেছে। আর আমার বাড়ি হচ্ছে এক রুম বিশিষ্ট।

যে ঘরে আমার কন্যা ঘুমিয়ে আছে, সেখানে আমি থাকতে পারি না। কারণ, আমি আমার নফসকে বিশ্বাস করি না। তাই আমি বাহিরে শুয়ে আছি।

দেখুন, একজন জান্নাতি সাহাবী স্বীয় নফসের ব্যাপারে কতটা সতর্ক ছিলেন। আর আজকাল আমরা?

এই গোনাহের পিছনে ইন্ধনদাতা কে?

নফস হচ্ছে বিড়ালের মতো। বিড়াল যখন কোনো কিছু খেতে আসে, তখন সাধারণত আমরা তাকে তাড়িয়ে দিই। যখন আমরা তাকে তাড়িয়ে দিই তখন সে চলে যায়। তবে যাবার সময় পেছন ফিরে বেশ কয়েকবার তাকায়। কয়েকবার থমকে দাঁড়ায়। আবার সে খাবারের কাছে আসতে চায়। এভাবে থমকে থমকে, পেছন ফিরতে ফিরতে সেখান থেকে চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার খাবারের সন্নিকটে আসে। ওই খাবারে আবার মুখ দিতে চায়। ঠিক তখনই আপনি যখন আবার তাকে তাড়িয়ে দিবেন, সে দৌড়ে পালিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর আপনার অগোচরে আবার খেতে আসবে। আপনি তাকে আবার তাড়িয়ে দিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই খাবারটা আপনি তার নাগালের বাইরে না নিচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বেহায়ার মত বারবার ওই খাবারের কাছে যাবেই।

আমাদের নফস ঠিক সেই বিড়ালের মত বেহায়া। সে বারবার তার মনের চাহিদাকে পূরণ করতে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত নফসের উপর লাগাম না দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কৃতকর্ম থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। বেহায়ার মত অশ্লীলতার দিকে ছুটেই চলবে। যতই বাধা দিবেন, ততই সেদিকে যাবে।

উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে নানান সময়, নানান গোনাহ আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়। কোনো গোনাহ শয়তানের প্ররোচনায়, আবার কোনো গোনাহ নফসের প্ররোচনায়। আবার কোনো কোনো গোনাহ উভয়ের ওয়াসওয়াসায় সংঘটিত হয়। আমরা গোনাহ করি, কিন্তু বুঝতে পারি না— গোনাহের পিছনে কার হাত রয়েছে? এই গোনাহের পেছনে কে ওয়াসওয়াসা দিয়েছে—শয়তান, নাকি নফস। আমরা যখন বুঝতে পারি

না—আমরা কার দ্বারা প্রভাবিত। তাই এর সঠিক ট্রিটমেন্টও করতে পারি না।

আসুন জেনে নিই, নফস এবং শয়তানের কৃত প্ররোচনার ধরন...

আপনি রাস্তায় বের হয়েছেন। আপনার সামনে দিয়ে একজন বেপর্দা বেগানা নারী হেলে-দুলে হেঁটে যাচ্ছে। প্রথমবার তার দিকে চোখ পড়েছে। এটা শরীয়তে মাফ। প্রথমবার দেখার পর পরই আপনি তার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। এবার নফস এবং শয়তানের খেলমা দেখুন। আপনি ওই মেয়ে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। এবার আপনার মনে যদি এটা উদয় হয়—বাসায় গিয়ে মোবাইলে অশ্লীল ভিডিও দেখবো। বাসায় গিয়ে আকাম-কুকাম করবো। এরকম যদি মনে মনে উদয় হয়, তখন বুঝে নিবেন এগুলোর পেছনে ইন্ধনদাতা হচ্ছে শয়তান। অপরদিকে আপনি ওই মেয়ের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, আপনি ভাবছেন আর দেখব না, চোখ নিচে নামিয়ে হেঁটে চলে যাব। কিন্তু আপনার ভেতর থেকে ওয়াসওয়াসা আসছে— দেখ, একবার দেখ, একবার দেখলে কিছুই হবে না; বরং মজা পাবি। আপনি বারবার বারণ করছেন, কিন্তু ভেতর থেকে বারবার ওয়াসওয়াসা আসছে—"দেখ দেখ, আবার দেখ, কত সুন্দর মেয়ে, তাড়াতাড়ি দেখ না! নয়তো চলে যাবে।" যদি এরকম হয় তবে আশরাফ আলী তানুভি রহি. বলেন— বুঝে নিবেন, এই গোনাহের পিছনে ইন্ধনদাতা হচ্ছে বেহায়া নফস। বেহায়া এ কারণে যে, আপনি বারবার বারণ করেছেন—"দেখবো না, দেখবো না; এতে আমার পাপ হবে, এর কারণে আমার চোখে গরম সিসা ঢালা হবে।" এতবার বারণ করার পরও সে ওই বেগানা নারী দেখে মনোবৃত্তি পূরণ করল। এজন্যই নফসকে বলা হয়, বিড়ালের মত বেহায়া।

নফসের গোলামীর কারণ

১. শৈশবে নফসকে নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত না হওয়া:

এটা হয়ে থাকে মা-বাবার ভুল প্যারেন্টিং-এর কারণে। অতি আদুরে বাচ্চা শৈশবে মা-বাবার কাছে যা-ই বায়না ধরে, তা-ই সে পেয়ে যায়। মা-বাবাও সন্তানের আবদার পূরণে কোনো কমতি রাখেন না। তারা দেখে না, কোনটা হালাল কোনটা হারাম। শুধু এটাই ভাবে—আমার বাচ্চা চেয়েছে তাকে এটা দিতেই হবে।

আমাদের প্যারেন্টিং -এ এতটাই ঘাটতি যে, বাচ্চা যখন টিভি,আইপ্যাড ইত্যাদির বায়না ধরে—তখন সাথে সাথে আমরা তা তার হাতে তুলে দিই! এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না—এটা ভালো নাকি খারাপ। অথচ, টিভি আইপ্যাড এগুলো অশ্লীলতার কারখানা। আর আপনি আমি বাচ্চার নফসের চাহিদা মেটাতে, সেই শৈশবেই তার জন্য এইসব আসবাবের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। শুধু তাই নয়, শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে অভ্যস্ত না করে উল্টো তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছি। ফজরের আজান দিচ্ছে, বাচ্চাকে না ডেকে বলি,'বাচ্চা মানুষ, এখন নামাজ না পড়লেও সমস্যা নেই। তার পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমের দরকার; সে ঘুমাক।'

বাচ্চারা যখন যা চাচ্ছে, আমরা তখনই তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা বাচ্চাদের মনোক্ষুন্ন করতে চাই না; তারা মন খারাপ করে থাকুক, এটাও চাই না। এজন্য, সে যখন যা চায় তখনই তার হাতে আমরা সেটা তুলে দিই। অথচ একবারও ভেবে দেখি না—এটা তার জন্য কল্যাণকর নাকি অকল্যাণকর। একবারও মাথায় রাখি না—এই চাওয়া-পাওয়া গুলো তার ভবিষ্যতের জন্য কতটা ক্ষতিকর।

আসলে, প্রকৃত-পক্ষে তার এই চাওয়া-পাওয়া গুলো নফসের চাহিদা বৈ কিছুই নয়। আমাদের ভুল প্যারেন্টিং -এর কারণে সে ছোটবেলা থেকেই নফসের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করে বেড়ে ওঠে। শৈশবকাল থেকেই তার নফস যা চেয়েছে, আমরা তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সে যা-ই চেয়েছে, তা-ই পেয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ ছিলনা বাধাদানকারী। নফসের তাকাজা অনুযায়ী সে যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে। আর এই পাওয়া গুলো শৈশবেই কেড়ে নিয়েছে তার ফিতরাতে নফসানিয়্যাহ। ফলে, ধীরে ধীরে তার চলাফেরা থেকে শুরু করে সবকিছুই লাগামহীন হয়ে যায়। শৈশব কাল থেকেই সে তার নফসের চাহিদার বিপরীত যায়নি, ফলে বড় হওয়ার পরও সে তার নফসের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। শৈশব থেকেই নফসকে দিতে দিতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই যৌবনে পদার্পণ করার পরও সে আর ওই অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। যৌবনে পদার্পণ করার পর, শৈশবের মতোই নফসকে দিতেই থাকে। কেননা, নফসের গোলামী তার পুরনো দিনের অভ্যাস। আর এ- জন্য সম্পূর্ণরূপে মা-বাবাই দায়ী। কারণ, সে তার বাচ্চাকে শৈশব কাল থেকে নফসকে নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রতি তাগিদ দেয়নি। সে তাকে শরীয়তের বিধি-বিধান এ অভ্যস্ত করে তোলেনি। অতি আদরকে প্রাধান্য দিয়ে, তার খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ছেড়ে দিয়েছে।

বাচ্চাদের নফস রয়েছে। তাদেরও রয়েছে নফসের চাহিদা। কেবল যৌবনের চাহিদা একটু বিলম্বে আসে, তবে অন্যান্য চাহিদা শৈশব থেকেই বিদ্যমান। বাচ্চাদের নফসও খেয়াল-খুশির পিছনে ছুটে। তাই, আমাদের উচিত তাদের অবৈধ অনৈতিক অকল্যাণ জনক কোন আবদার পূরণে বিরত থাকা। সে যদি না-বুঝে প্রয়োজনে তাকে শাস্তি দেয়া। নফসের চাহিদার বিপরীত কাজ করতে সর্বদাই তাকে উদ্বুদ্ধ করা। তাকে নফসের নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হতে প্রশিক্ষণ দেয়া। সাহাবায়ে কেরাম তাদের বাচ্চাদের সেভাবেই গড়ে তুলেছেন। তারা তাদের বাচ্চাদের শৈশবেই নফস নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হতে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাদের সাথে নামাজ পড়তে, রোজা রাখতে বাচ্চাদেরও উদ্বুদ্ধ করেছেন। শরিয়তের বিধি-বিধানে শৈশবেই তাদেরকে অভ্যস্ত করেছেন।

এ ব্যাপারে একটি হাদিস রয়েছে: রুবায়্যি' বিনতু মু'আব্বিয রাযি. থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেন, 'আশুরার সকালে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ দিলেন: যে ব্যক্তি সওম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যার সওম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন সওম পূর্ণ করে। তিনি (রুবায়্যি') রাযি. বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন সওম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের সওম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।[১০]

লক্ষ্য করে দেখুন—সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা রোজা রাখার পাশাপাশি বাচ্চাদেরকে রোজা পালন করাতেন। কারণ, তারা জানতেন—এখন থেকে রোজা রাখলে এটা ধীরে ধীরে তার অভ্যাসে পরিণত হবে, ফলে পরবর্তীতে রোজা রাখতে তার কোনো সমস্যা হবে না।

তাই আমাদের উচিত—ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদেরকে সেভাবে গড়ে তোলা। তাদের অনর্থক চাহিদার বিরুদ্ধে গিয়ে, নফসকে নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করে তোলা। যেন, বড় হয়ে সে নিজেই নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

এই নফসের গোলামী, দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই বরবাদ করে দেয়। উভয় জগতে তার জন্য দুঃখ-কষ্ট বরাদ্দ হয়ে থাকে। নফসের গোলামী করতে গিয়ে, যখন বিভিন্ন খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে নামাজ রোজা আদায় করতে দূরে সরে যায়, তখন সে পরকালের সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অপরদিকে, নফসের গোলামী করে যখন অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করে, তখন ঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারে না, নিজেকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারে না, ফলে দুনিয়ার ভবিষ্যৎও অন্ধকার হয়ে যায়।

[১০] সহিহ বুখারী, হাদিস নং - ১৯৬০

দারিদ্রতা তাকে গ্রাস করে নেয়। বাকিজীবন কঠোর পরিশ্রম করেই কাটাতে হয়, তবু তার দারিদ্রতা মোচন হয় না। সর্বদা সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে। শুধু তাই নয়—নফসের গোলামী করতে গিয়ে মান-ইজ্জতও খুইয়ে ফেলে। নফস যখন খারাপ কাজে অগ্রসর হতে প্রেরণা দেয়, তখন সে সেটাই করে। আর লোক সমাজে ঐ কাজটা কেউ-ই ভালো চোখে দেখে না। যার ফলে নিজের মান-সম্মান, পরিবারের মান-সম্মান সব কিছু ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।

আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তার নফস যখন লাগামহীন হয়ে যায়, তখন সমাজের চোখে সে খারাপ হয়ে যায়। ফলে, অতি সহজে তার বিয়ের প্রস্তাব আসে না। আসলেও, ভালো কোনো জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে না। তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। বিয়ে হলে, কোনো গুন্ডা মাস্তান বাজে প্রকৃতির লোকের সাথেই হয়। ফলে, তার পরবর্তী জীবন দুঃখ- কষ্টকে সাথী করেই কাটাতে হয়। আর এ- সব কিছুই হয়—নফসের গোঁড়ামির কারণে। আর নফসের গোঁড়ামির কারণ খুঁজতে গেলে, মা-বাবার ভুল প্যারেন্টিং-ও উঠে আসে।

২. নফসের অনুসারীর সঙ্গে ওঠাবসা:

আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন—অনেক ভাইয়েরা এক সময় আগে আগে মসজিদে আসত। তাকবিরে ওলার সাথে প্রথম কাতারে নামাজ পড়ত। কিন্তু, হঠাৎ করে তাদের আর মসজিদে দেখা যায় না। মসজিদের ধারে কাছেও আসে না। এই মানুষটাই দাড়ি রাখতে শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আবার ক্লিন শেভ। তাকে আগে দেখা যেত— বিভিন্ন দীনি মজলিসে , আর এখন দেখা যায় বিভিন্ন নাচ-গানের আসরে। আগে তাকে খুব একটা রাস্তায় দেখা যেত না, কিন্তু এখন তাকে প্রায়-ই দেখা যায় রাস্তার মোড়ে বখাটে ছেলেদের সাথে।

এরকম ঘটনা অনেক আছে। অনেক ছেলেদের সাথেই এরকম হয়। অনেক ছেলেরাই আছে—যারা এক সময় নিয়মিত নামাজ পড়ত, কিন্তু পরবর্তীতে বখাটে ছেলেদের সাথে মিশে খারাপ হয়ে গেছে।

নফসের গোলামীর আরেকটি কারণ হচ্ছে—যারা সব সময় নফসের গোলামী করে, নফসের অনুসরণ করে, প্রবৃত্তির তাড়নায় ছুটে চলে—তাদের সাথে ওঠাবসা করা, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা। সাধারণত, যে ব্যক্তি যার সাথে সবচে বেশি চলাফেরা করে, যার সাথে প্রায়-ই ওঠাবসা করে, তার সাথেই একটি মহব্বতের সম্পর্কে জড়ায়। ফলে, তার আচার-আচরণ, তার স্বভাব, সবকিছু তার সঙ্গীর মধ্যেও বিস্তার হতে থাকে। তাই, যখন একজন ভালো মানুষ একজন নফসের অনুসারীর সঙ্গে ওঠাবসা শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে সেও নফসের অনুসারী হয়ে যায়। যখন সে দেখে—তার পাশে বসেই তার বন্ধু স্মোক করছে, তখন তার নফসও স্মোক করার জন্য তাকে প্রেরণা দেয়। যখন দেখে—তার বন্ধু তার সামনেই বেগানা নারীদের দেখে মজা নিচ্ছে, তখন তার নফসও তার দেখাদেখি বেগানা নারীকে দেখার জন্য, উপভোগ করার জন্য পাগল হয়ে যায়।

মোটকথা, খারাপ নফসের অধিকারী ব্যক্তির প্রভাব, তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির নফসের ওপরেও পড়ে। তার সাথে ওঠাবসা করতে করতে ধীরে ধীরে তার নফসও তার বন্ধুর নফসের মত লাগামছাড়া হয়ে যায়। এজন্য, আমাদের উচিত খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে, সব সময় আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক করা

৩. আমাদের সমাজ ব্যবস্থা:

নফসে গোলামীর আরেকটি কারণ হচ্ছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের কালচার। সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে কোনো এক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, তাই এখানে এড়িয়ে গেলাম।

৪. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা:

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে অনেক অনেক ঘাটতি। সঠিক জ্ঞানের অভাবে মানুষ নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে জানে না। শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা, তাকে নফসের গোলাম বানিয়ে দেয়।

৫. আমাদের দৈনন্দিন রুটিন:

আমাদের দৈনন্দিন রুটিন অনেকটা নফসের চাহিদার অনুকূলে। আমাদের রুটিন: সারাদিন খেলাধুলা, আড্ডাবাজি, স্কুল-কলেজ, কাজ আর কাজ, বিভিন্ন ব্যস্ততা। ঠিক নফসের চাহিদাও অনুরূপ। তাই তো খুব সহজেই আমরা নফসের গোলাম হয়ে যাই।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

নফসের ধোঁকায় পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যাযজ্ঞ

আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করার পর,তিনি হযরত আদম আ. ও বিবি হাওয়া আ. -কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। পৃথিবীতে আগমনের পর হযরত আদম আ. ও বিবি হাওয়া আ. -এর সন্তান জন্ম হতে লাগল। ধীরে ধীরে মানুষ বাড়তে লাগলো পৃথিবীতে। কিন্তু এখানে দৃশ্যত একটি সীমাবদ্ধতা থেকে গেল। আদম আ. ও হাওয়া আ. যেহেতু পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী, তাই তাদের পরের প্রজন্মে যত সন্তানের জন্ম হবে, তারা সকলেই হবে ভাই-বোন। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে, ভাই-বোনের মাঝে কখনো বিয়ে হয় না। সেই হিসেবে এটিই হতো পৃথিবীর শেষ মানব প্রজন্ম। এরপর মানবজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু এখানে তো পুরো মানবজাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন, তাই বিশেষ একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এর সমাধান করা হলো।

বিবি হাওয়ার গর্ভে তখন সন্তান জন্ম নিতো জোড়ায় জোড়ায়। প্রতি জোড়ায় একজন ছেলে আর একজন মেয়ে জন্ম হত। এক-ই জোড়ার ছেলে ও মেয়ে পরস্পর বিয়ে করতে পারবে না; বিয়ে করতে হলে ভিন্ন জোড়ার কাউকে করতে হবে। কাবিল ও হাবিল ছিল ভিন্ন জোড়ার, তাই তাদের ব্যাপারটি স্বাভাবিক নিয়মেই সমাধান হয়ে যায়—একজন আরেকজনের জোড়ার মেয়েকে বিয়ে করবে।

কিন্তু এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়—হাবিলের জোড়ার মেয়েটি তেমন সুন্দরী ছিল না। সেই তুলনায় কাবিলের জোড়ার মেয়েটি ছিল অনেক বেশি সুন্দরী। নিয়ম অনুসারে হাবিল অধিক সুন্দরী মেয়েটিকে পায় আর কাবিল পায়, কম সুন্দরী মেয়েটিকে। কিন্তু, কাবিল বেঁকে বসে—সে হাবিলের জোড়ার মেয়েটিকে বিয়ে করবে না। যেভাবেই হোক, নিজের জোড়ার সুন্দরী মেয়েটিকেই বিয়ে করবে।

এমতাবস্থায়, পিতা হযরত আদম আ. একটি মীমাংসা করলেন। তাদের দু'জনকে আল্লাহর নামে কুরবানি দিতে বললেন। যার কুরবানি আল্লাহ গ্রহণ করবেন, তার ইচ্ছেই জয়ী হবে। কার কুরবানি গৃহীত হলো, আর কার কুরবানি গৃহীত হলো না, তা কীভাবে বোঝা যায়? তখনকার কুরবানি এখনকার কুরবানির মতো ছিল না—সে সময়ে কোনো জিনিস কুরবানি দিলে আসমান থেকে আগুন এসে ঐ জিনিসকে পুড়িয়ে দিত। কুরবানির বস্তুকে ভূমি থেকে উপরে কোনো স্থানে উপস্থাপন করা হত, আকাশ থেকে আগুন এসে যদি বস্তুকে পুড়িয়ে দিতো, তাহলে বোঝা যেত—আল্লাহ কর্তৃক কুরবানি গৃহীত হয়েছে।

তো, পিতা আদম আ. -এর দেওয়া মীমাংসা অনুযায়ী, তারা উভয়েই কুরবানির বস্তু উপস্থাপন করল। হাবিল একটি সুস্থ ও মোটাতাজা দুম্বা উৎসর্গ করলো, অপরদিকে কাবিল তার কিছু সবজি ও শস্য উৎসর্গ করল। তখন সবজি ও শস্যও কুরবানির জন্য উৎসর্গ করা যেত। কোনো কোনো উৎস থেকে জানা যায়—হাবিল উৎসর্গ করেছিল উৎকৃষ্ট মানের দুম্বা, আর কাবিলের শস্য ছিল নিকৃষ্ট মানের।

আল্লাহ হাবিলের কুরবানিকেই কবুল করলেন। উপর থেকে আগুন দিয়ে দুম্বাটিকে পুড়িয়ে নিলেন, কিন্তু কাবিলের শস্যকে কিছুই করলেন না। সে হিসেবে বিয়ের নিয়ম আগের মতই রইল, হাবিল বিয়ে করবে কাবিলের জোড়ায় জন্ম নেয়া মেয়েটিকে।

কিন্তু কাবিল এই অপমান সহ্য করতে পারল না। সে ভাবল—হাবিলের জন্য তার কুরবানি আল্লাহ গ্রহণ করেননি। কুরবানিতে প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে এবং স্ত্রী হিসেবে কাঙ্ক্ষিত মেয়েকে না পাওয়াতে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। ক্রোধের বশে হাবিলকে সে বলল, "তোর ইচ্ছে কোনোভাবেই আমি পূরণ হতে দেব না। প্রয়োজনে তোকে হত্যা করব, যেন তুই আমার জোড়ার মেয়েটিকে বিয়ে করতে না পারিস।"

কাবিলের এমন আচরণে হাবিল অনেক সুন্দর উত্তর দিয়েছিল। সে বলেছিল, "আল্লাহ তাদের কুরবানিই কবুল করেন যার উদ্দেশ্য সৎ। আর তুমি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেও, আমি আমার হাত তোমার দিকে সম্প্রসারিত করব না। কারণ, আমি আমার প্রতিপালককে ভয় করি।" কিন্তু এই কথায় কাবিলের উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন হলো না। উল্টো তার নফস তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অতঃপর সে তাকে হত্যা করল।

এরপরই কাবিলের মন গলে যায় এবং অনুভব করে, আহারে, কত বড় ভুল করে ফেলল সে! নিজের ভাইকে নিজ হাতে মেরে ফেলল, এর চেয়ে বড় ধৃষ্টতা আর কী হতে পারে! ভেতরে ভেতরে সে অনেক অনুতপ্ত হলো এবং নিজের অপকর্ম কীভাবে ঢাকবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তখনো মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে কোনো নিয়ম তৈরি হয়নি, কারণ এর আগে কোনো মানুষের মৃত্যু ঘটেনি। মৃত দেহটিকে নিয়ে কী করবে এ নিয়ে যখন সে চিন্তায় মগ্ন তখন দেখল, একটি কাক তার ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে একটি গর্ত করল। তারপর সেই গর্তে একটি মৃত কাককে টেনে এনে কবর দিয়ে দিল। এটি দেখে কাবিল ভাবল, তাকেও হয়তো এভাবে কবর দিতে বলা হচ্ছে। তাই একটি গর্ত করে সে তার ভাইকে কবর দিয়ে দিল। ইসলামের ইতিহাস অনুসারে এটিই ছিল মানবজাতির প্রথম কবর। কোনো কোনো উৎস থেকে জানা যায়, কাক দু'টি ছিল ফেরেশতা এবং এদেরকে আল্লাহই পাঠিয়েছিলেন, যেন এদের দেখে কাবিল শিখতে পারে। আর একটি কথা না বললেই নয়—পৃথিবীতে যতগুলো হত্যার কান্ড ঘটবে, তার পাপের একটি অংশ কাবিলের নামেও যাবে.

এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস আছে। রাসুল (সা:) বলেছেন, "পৃথিবীতে যখনই অন্যায়ভাবে কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন পাপের একটি অংশ

অবশ্যই আদমের প্রথম পুত্র কাবিলের উপর পড়ে। কেননা সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে।[১১]

এবার আসি মূল আলোচনায়। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করলাম। কাবিল কর্তৃক হাবিলকে হত্যার ঘটনা আমরা কম-বেশি সবাই জানি। এটা কি জানি—কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করতে নফস উদ্যত করেছিল? এই নফসের ধোকায় পড়ে কাবিল তার ভাইকে হত্যা করেছে। এই ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত আছে—

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অনুবাদ: অতঃপর তার নফস তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[১২]

দেখুন, এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—কাবিলকে তার নফস উদ্বুদ্ধ করেছে, তার ভাইকে হত্যা করতে। যদিও, প্রকৃতপক্ষে মেয়েলী কারণে সে বেঁকে বসে, কিন্তু সেটাও ছিলো নফসের-ই ধোঁকা। শেষ পর্যন্ত নফসের গোলামী করে সে তার ভাইকে হত্যা করে।

নফস কী-না করতে পারে, যদি তা লাগাম ছাড়া হয়! পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম হত্যা যজ্ঞ নফসের তাড়নায় সংঘটিত হয়। আর এই নফসের কারণেই, আজ অবধি যতো হত্যার ঘটনা ঘটবে, প্রত্যেক হত্যার পাপের একটা অংশ কাবিলের নামেও যাবে। যদিও শয়তান ছিল সেখানে পরামর্শদাতা, তবে সব কিছু বাস্তবায়ন করেছে কাবিলের নফস। একটা লাগামহীন নফস, কাবিলকে দিয়ে হত্যার সূচনা করে। একটি পাপ কাজের সূচনা করে। এখন এই লাগামহীন নফস আমাদের দিয়ে কোন পাপ কাজের সূচনা করবে না—তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? না, নেই। তা এখনো বলবৎ আছে। এখনো এরকম অনেক পাপ কাজের সূচনা হচ্ছে, যা মূলত

---

[১১] আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহা সূত্রে মুসনাদে আহমদ,

[১২] সূরা মায়িদা, আয়াত- ৩০

শয়তানের পরামর্শ আর নফসের বাস্তবায়নে হয়। এখন আপনি আমি যদি, নফসের উপর লাগাম না দিই, তাহলে আমাদের দ্বারাও নতুন নতুন পাপ কাজের সূচনা হবে। আর সেই পাপ কাজ এ-পৃথিবীতে যতদিন সংঘটিত হবে, সেই পাপ কাজের একটা গোনাহের অংশ আপনার আমার কাঁধেও যাবে। তাই, সময় থাকতে আমাদের প্রত্যেকের উচিত নফসে উপর লাগাম দেওয়া; নফসের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া।

নফসের ধোঁকায় আযীযের স্ত্রী জুলাইখার পদস্খলন

বিনা অপরাধে ইউসুফ আ. -কে কারাবাদ্ধ হয়ে থাকতে হয় বেশ কিছুদিন। মাঝখানে এক বাদশাহ ইউসুফ আ. -এর করা স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও তদবির শুনে মুগ্ধ হয়ে যান এবং তিনি অনুমান করেন যে, এই ব্যক্তি যাকে বেশ কিছুদিন থেকে জেলে রাখা হয়েছে, তিনি অসাধারণ জ্ঞান, মর্যাদা ও উচ্চ যোগ্যতার অধিকারী। সুতরাং বাদশাহ তাকে দরবারে উপস্থিত করার জন্য আদেশ দিলেন।

কিন্তু, ইউসুফ আ. এভাবে কারামুক্ত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কেননা, ইউসুফ আ. যখন দেখলেন —বাদশাহ সম্মান দিতে প্রস্তুত, তখন তিনি এইভাবে শুধু অনুগ্রহের পাত্র হয়ে জেল থেকে বের হওয়া পছন্দ করলেন না; বরং, আপন চরিত্রকে উচ্চ এবং নিজের পবিত্রতাকে সাব্যস্ত করাকে প্রাধান্য দিলেন, যাতে পৃথিবীর সামনে তার নির্মল চরিত্র ও সুউচ্চ মর্যাদা পরিস্ফুটিত হয়ে যায়। ইউসুফ আ. -এর দাবি—আমি নির্দোষ এটা প্রমাণ হতে হবে, এবং ঐ মহিলাকে তা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, সে নিজেই অপরাধী।

বাদশাহ, ইউসুফ আ. -এর এই বক্তব্য শুনে, ঐ মহিলাদের জিজ্ঞেস করলে, প্রত্যেকেই ইউসুফ আ. -এর পবিত্রতার কথা স্বীকার করল। এখন আযীযের স্ত্রী জুলাইখারও এই কথা স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায় থাকল না। সে স্বীকার করল যে, "ইউসুফ নির্দোষ এবং প্রেমের পয়গাম আমার পক্ষ থেকেই ছিল। ইউসুফের এই ত্রুটির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।"

সে আরো বললো—আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না; কেননা, নফস তো মন্দ কাজে প্ররোচিত করতেই থাকে। অর্থাৎ, আযীযের স্ত্রী'র বক্তব্য—আমাকে আমার নফস তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। নফসের প্রতারণায় পড়ে

আমি ইউসুফকে আমার ফাঁদে ফেলার ইচ্ছে করেছিলাম। কিন্তু সে আমার ফাঁদে পড়েনি। আমার নফস আমাকে এই খারাপ কাজে অগ্রসর করেছে।

এবার আসি মূল আলোচনায়। এই ঘটনার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করলাম এটা জানানোর জন্য যে, জুলাইখাও কিন্তু নফসের ধোঁকায় পড়ে এই কান্ড ঘটিয়েছিলো। নফসের প্রতারণায় সে ইউসুফ আ. -কে তার প্রতি ফুঁসলিয়েছে। আর তার এই নফস ছিল লাগাম ছাড়া, নফসে আম্মারা। যদি তার নফস লাগামহীন না হতো, তাহলে কখনোই সে এই অসামাজিক অশালীন কান্ড ঘটাত না। এটাই কুরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে—

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

জুলাইখার বক্তব্য: আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না, কেননা মানুষের নফস তো খারাপ কর্ম-প্রবন।

অতএব, আমাদের নফস যদি লাগামহীন হয়ে যায়, তাহলে সে কাউকে ছাড় দিবে না, তাই, আমাদের উচিত সময় থাকতে নফসকে নিয়ন্ত্রণ আনা। সময় থাকতে তাকে লাগাম পড়ানো। সময় থাকতে তাকে শেকলবন্দি করা।

নফসের ধোঁকায় অপবাদ রটানো

নফসের গোলামী করার আরেকটি ক্ষতি হচ্ছে—সে আপনাকে অপবাদকারী রূপে ব্যবহার করবে। নফস যদি লাগামহীন হয়ে যায়, তখন তার চোখে আলোকে অন্ধকার, আর অন্ধকারকে মনে হয় আলো। মিষ্টি'কে মনে হয় তিক্ত, আর তিক্তকে মনে হয় মিষ্টি। সাদাকে মনে হয় কালো, আর কালোকে মনে হয় সাদা! মোটকথা, তার অন্তর্দৃষ্টি সঠিক বিষয়টা অনুধাবন করতে পারে না। ফলে সে সতী-সাধ্বী নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। তার কাছে সবাই নিকৃষ্ট, সবাই খারাপ। আর এটা হয়, নফসের ত্রুটি বিচ্যুতির কারণেই। সে অশ্লীল পাপাচারে লিপ্ত থেকে তার নফসকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে—এখন দুনিয়ার সবাইকেই তার নিজের মত মনে হয়। মনে হয় সবাই খারাপ, সবাই পাপাচারে লিপ্ত, সকলেই তার মতো কোনো না কোনো গর্হিত কাজে নিয়োজিত।

নফস যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তখন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে একদম কলুষিত হয়ে যায়। ফলে তার অন্তর্দৃষ্টি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, সর্বদাই সতী-সাধ্বী নারীদেরকে অপবাদে সিদ্ধহস্ত। সব সময় সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। প্রকৃত বিষয়টি যাচাই-বাছাই না করেই, যে-কারো উপর মিথ্যে অপবাদ আরোপ করে।

সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই নিন্দনীয় এবং দণ্ডনীয়। ইসলামে নারীর মর্যাদা অন্য যে-কোনো ধর্মের চেয়ে বেশি। অমুসলিম বিশিষ্ট নারীরাও এ কথা স্বীকার করেছেন। দুনিয়ার সব সমাজেই নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করার ক্ষেত্রে অপবাদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইসলামে অপবাদ সৃষ্টি গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদের যে-কোনো প্রবণতার বিরুদ্ধে ইসলাম কঠোর

অবস্থান ঘোষণা করেছে। কেউ যাতে তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায় সাহসী না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করতে পবিত্র কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহপাক ঘোষণা করেন...

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অনুবাদ : 'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ মু'মিন নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।'[১৩]

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহপাক সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন— কোনো সতী-সাধ্বী নারীর ওপর ব্যভিচার ও অশ্লীলতার অপবাদ আরোপকারী ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত, তার জন্য গুরুতর শাস্তি অপেক্ষমাণ। দুনিয়াতেও তাকে শাস্তি পেতে হবে।

আর তাছাড়া, সতী-সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ দেওয়া সমাজভুক্ত মানুষের সুসম্পর্ক নষ্ট করে। সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সৃষ্টির মদদ জোগায়— এ-ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রবণতা।

জাহেলি যুগের আরব অধিবাসীরা একে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ সৃষ্টি এবং সংঘাতে মদদ জুগিয়ে আনন্দ পেত। ইসলামে এ- ধরনের কর্মকাণ্ডকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটেও দেখা যায়, সাধারণত অজ্ঞ এবং কুচক্রী লোকজনই অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ায়। অযৌক্তিকভাবে তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কারোর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও

---

[১৩] সূরা আননূর-২৩

নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে তা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ঘোষণা করা হয়েছে।

সতী-সাধ্বী নারীদের ওপর মিথ্যা অপবাদ রটানোর প্রবণতা পূর্বেই ছিলো। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. -এর ওপরও অপবাদ রটানো হয়েছে।

যাহোক, নারীদের চরিত্রের ওপর অপবাদ রটনাকারীরা কী পরিমাণে অভিশপ্ত, তা বোঝানোর জন্য একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। রাসূল সা. বলেছেন...

সাতটি ধ্বংসকারী পাপ থেকে তোমরা বেঁচে থাক। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, সা. ঐ গুলো কী ? উত্তরে তিনি বললেন, ঐগুলো হলো- আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, সরল মুমিনা স্ত্রী লোকের ওপর অপবাদ আরোপ করা[১৪]

[১৪] ফাতহুল কারী ৫/৪৬২ মুসলিম ১/৯২, উদ্ধৃত: তাফসীরে ইবনে কাসীর।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

নফসের ব্যাধি: ১

অহংকার

অহংকার পতনের মূল—এ-কথা প্রচলিত। নৈতিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে এটি যেমন সত্য, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এ-কথা প্রমাণিত যে, অহংকার ও দাম্ভিকতা পতন ডেকে আনে।

আত্ম-অহমিকা বলা হয়—নিজের গুনে নিজেই মুগ্ধ হয়ে নিজেকে বড় মনে করা। আর অহংকার বলা হয়—নিজের গুনে নিজেই মুগ্ধ হয়ে নিজেকে বড় ভাবার পাশাপাশি, অন্যকে তুচ্ছ মনে করা। শরিয়তের দৃষ্টিতে উভয়টিই হারাম।

আত্ম-অহমিকা, দাম্ভিকতা ও অহংকার নফসের এক নিকৃষ্ট ব্যাধি। নফসের এই ব্যাধি দূর করা আমাদের উপর আবশ্যক। কেননা, অহংকারী মানুষকে আল্লাহ খুব অপছন্দ করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন..

'নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অহংকারীদের ভালোবাসেন না।'[১৫]

মহান আল্লাহ'র সঙ্গে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ হলো অহংকার। আল্লাহ তাআলা বলেন...

'যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। শুধু সে অহংকারবশত সিজদা করতে অস্বীকার করল। আর সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।'[১৬]

---

[১৫] সূরা : নাহল, আয়াত : ২৩

অহংকার, ইবলিসকে শয়তানে পরিণত করেছে। সে অহংকার করেছিল নফসের প্ররোচনায়। লাগামহীন নফস যখন ইবলিশের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন সে অহংকারবশত তার স্বীয় রবের হুকুম অমান্য করে। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

অহংকার শয়তানি কাজ। আর অহংকার মুক্ত থাকা, আল্লাহ ওয়ালাদের কাজ। অহংকার একজন মানুষের পরিচয় প্রকাশ করে—সে কি আল্লাহ ওয়ালা, নাকি শয়তান ওয়ালা। এতদসত্ত্বেও আজ আমরা অহংকার নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত।

অহংকারীদের জায়গা হচ্ছে, জাহান্নাম। যেটা রাসূল সা. সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন...

হারিস ইবনু ওয়াহাব খুযাঈ রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলবো না? তারা দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু তারা যদি কোনো ব্যাপারে আল্লাহ'র নামে কসম করে বসেন, তাহলে তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলবো না? তারা রূঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারাই জাহান্নামী।[১৭]

অপর একটি হাদীসে এসেছে...

অহংকারী মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন সাহাবি বলেন, মানুষ তো চায় যে তার কাপড় সুন্দর হোক এবং তার জুতা সুন্দর হোক (এটা কি অহংকার

---

[১৬] সূরা : বাকারা, আয়াত : ৩৪,

[১৭] সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৯১৮

বলে গণ্য হবে?) রাসুল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুন্দর। অতএব তিনি সুন্দর পছন্দ করেন। তবে অহংকার হচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান ও মানব অবমূল্যায়ন।'[১৮]

একবার বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি গর্ব করলে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কঠিন শাস্তি দেন। রাসুল (সা.)-এর যুগেও এমন একটি ঘটনা ঘটে যায়।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,'একদা এক ব্যক্তি এক জোড়া জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে (রাস্তা দিয়ে) চলছিল। তা নিয়ে তার খুব গর্ব বোধ হচ্ছিল। তার জমকালো লম্বা চুলগুলো সে খুব যত্নসহকারে আঁচড়ে রেখেছিল। হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভূমিতে ধসিয়ে দেন এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই নিচের দিকে নামতে থাকবে।'[১৯]

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা অহংকারী ও দাম্ভিকের সঙ্গে কথা বলবেন না, তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাকে গোনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন না।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির সঙ্গে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের গোনাহ থেকেও পবিত্র করবেন না,তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না এবং তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক রাষ্ট্রপতি ও দাম্ভিক ফকির।'[২০]

একটু ভাবুন—একজন অহংকারী ব্যক্তির ব্যাপারে এত বড় বড় ওয়িদ এসেছে। তবু আজ আমরা দাম্ভিকতা আর অহমিকায় লিপ্ত। আমরা নিজেরাই নিজের গুণে নিজেকে বড় ভাবতে শুরু করি। আর কেউ যদি

---

[১৮] মুসলিম, হাদিস : ৯১,
[১৯] বুখারি, হাদিস : ৫৭৮৯
[২০] মুসলিম, হাদিস : ১০৭

আমাদের কাজের দরুন প্রশংসা করে, তখন তো পা মাটিতেই পড়তে চায় না। আর এটা আমাদের জন্য হয় খুবই ক্ষতিকর। কেননা, নিজের প্রশংসা অন্যের কাছে শুনে আমরা ধীরে ধীরে কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে যাই। নিজের মধ্যে যে যোগ্যতাটুকু ছিলো তাও হারিয়ে বসি। মোটকথা, অহংকার একজন মানুষের ক্ষেত্রে ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের জন্য ক্ষতিকর।

তাই, আমাদের ওপর আবশ্যক হলো—যত দ্রুত সম্ভব অহংকার নামক নফসের ব্যাধি দূর করা। নফসের ব্যাধি দূর না করা অবধি চারিত্রিক,আত্মিক কোনোটারই উন্নতি হবে না।

কিছু কথন

- অহংকার ধ্বংসের সুতো বুনে। আর আমরা সেই সুতো ব্যবহার করে নিজেরাই নিজেদের আত্মিক উন্নয়নে কপাট লাগাই!

- অহংকার পতনের মূল। কারণ, অহংকার হচ্ছে সত্যকে উপেক্ষা করে মিথ্যের আশ্রয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। নিজেকে বড় মনে করে কল্পনার রাজ্যে এক বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করা। যেই অট্টালিকায় শুধু আপনি-ই রাজা; বাকি সব প্রজা।

- অহঙ্কার দমিয়ে রাখতে শিখুন, নতুবা এক দরজা দিয়ে বাঘ হয়ে ঢুকে, অপর দরজা দিয়ে ইঁদুর হয়ে বের হতে হবে।

- নফসকে এসলাহ্ করা যাবে না, যতক্ষণ না অহঙ্কারের মতো বড় শত্রু থেকে নিজেকে আত্মগোপন করছেন।

- আমি জানি—আমার মাথা আমার টুপির চেয়ে বড় নয়; আমি জানি—আমার দেহ আমার জামা থেকে বড় নয়। ঠিক তদ্রুপ, আমার কর্মও কখনো শিক্ষার উর্ধ্বে নয়; আমার ব্যক্তিত্বও অমুকের উর্ধ্বে নয়। তবে কেনো এত অহংকার? যদি তোমার আত্মমর্যাদা তোমার হৃদয়ের চেয়ে

বড় এবং তোমার অহংকার তোমার মাথার চেয়ে বড় হয়, তবে তা দূর করার চেষ্টা করো। কেননা, এটাই তোমাকে বিষন্নতায় নিক্ষেপ করবে; ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে।

➤ তুমি যতোই নিজেকে অহংকার মুক্ত দাবি করো-না কেন। অকারণে অন্যকে ঘৃণা করা, তোমার অহংকারী পরিচয় সর্বত্র প্রচার করছে। তাই, নিজেকে অহংকার মুক্ত দাবি না-করে, অহংকারের গোড়ায় নম্রতার পানি ঢালো।

➤ সংসারের উনুনে যদি অহংকারের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে সেই সংসার সুখের মুখ দেখতে পায় না। কর্তা-কর্তী'র মুখ নামক উনুন থেকে শুধু আগুনের ধোঁয়া-ই বের হয়; হিমেল শীতল হাওয়া নয়। এজন্যই বলা হয়—একজন অহংকারী মহিলা সংসারের পুরো কাঠামো বিনষ্ট করতে যথেষ্ট; একজন অহংকারী মহিলা গৃহে আগুন লাগাতে যথেষ্ট।

➤ অহংকার এমন এক চাদর, যা মানুষের সকল গুনাবলি ঢেকে নেয়। অহংকার এমন এক আবরণ, যা একজন মহৎ ব্যক্তির মহত্বকে ঢেকে দেয়। অহংকার এমন এক চাদর, যা একজন ভুলে ভরা মানুষের সমস্ত ভুলের উপর পর্দা টেনে দেয়। ফলে, ওই ব্যক্তি কখনো নিজস্ব ভুলের ব্যাপারে সম্যক অবগত হতে পারে না।

➤ অহংকার নিজের মধ্যেই পোষা যায়। খাবার সংগ্রহের কোনো চিন্তা থাকে না। কেননা, নফস জানে কীভাবে অহংকার নিজের মধ্যে পোষতে হয়; কীভাবে তাকে মোটা-তাজা করতে হয়।

➤ এই অনিশ্চিত জীবনে কীসের এত অহংকার? যেখানে প্রাণ বিয়োগে টানতে হয় অস্তিত্বের ইতি!

➤ মনে রাখবেন—অহংকার আপনাকে আমাকে মানসিক রোগী বানানোর জন্য যথেষ্ট। কেননা, অহংকারী নফস সর্বদাই প্রশংসার

দাবিদার। এদিকে আপনার আমার খ্যাতি সীমিত সময় পর্যন্ত বহাল থাকে। এক সময় প্রশংসার পরিবর্তে নিন্দা পেতে হয়—নানান জনের কাছ থেকে। তখন অহংকারী নফস এটা কখনোই মেনে নিতে পারে না। যার ফলে ডিপ্রেশন সর্বদাই আমাদের দরজায় কড়া নাড়তে থাকে।

- অহংকার নফসের এমন এক বিপদজনক অবস্থা, যা সর্বদাই আপনার আমার ধ্বংসের কূপ খননে ব্যস্ত। অহংকার নফসের এমন এক ব্যাধি, যা দু'জন ঘনিষ্ঠ মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে অগাধ ভূমিকা রাখে। অহংকার নফসের এমন এক ব্যাধি, যা মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা অব্যক্ত ভালোবাসা এবং যাবতীয় গুণাবলীকে গ্রাস করে নেয়। অহংকার নফসের এমন এক ব্যাধি, যা জ্ঞান অর্জনের রাস্তায় সর্বদাই প্রতিবন্ধকতা।

- আমরা বলি অমুক শিক্ষিত হয়েছে, অনেক বড় ডিগ্রি অর্জন করেছে, তাই দিন দিন তার অহংকার বৃদ্ধি পাচ্ছে—আসলে এই ধারণা ভুল। প্রকৃতপক্ষে, কোনো জ্ঞানী-ই, অহংকারী হতে পারে না। জ্ঞান হলো অহংকার দূর করার মাধ্যম, যতই জ্ঞান বাড়বে অহংকার ততই হ্রাস পাবে। পক্ষান্তরে যতই জ্ঞান কমবে, অহংকার ততই বৃদ্ধি পাবে।

- জীবনের দূরপাল্লায় তুমি কখনো সফলতার মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না, যদি তোমার অহংকার, তোমার ওপর বিজয় অর্জন করে। আগে অহংকার'কে পরাজিত করো, তারপর অন্যত্র বিজয় তালাশ করো।

- হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান গঙ্গোহী রহি. যখন কোনো ত্বলিবে ইলমের মধ্যে অহংকার দেখতে পেতেন, তখন তার এই অহংকারের চিকিৎসার জন্য তাকে আদেশ দিতেন, "তুমি দৈনিক পাঠকক্ষের সামনে ছাত্রদের জুতো ঠিক করে রাখবে!" আর যখন কোনো ত্বলিবুল ইলমকে বিনয়ী দেখতেন, তখন তার জুতো তিনি নিজেই ঠিক করে দিতেন! আল্লাহু আকবার!

নফসের ব্যাধি: ২

।রাগ।

এক

রাগ, নফসের এক অনন্য ব্যাধি। রাগ এমন, যা একজন মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। রাগের সময় বিবেক বুদ্ধি অচল হয়ে পড়ে; হুঁশ-জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে লোপ পায়। যার কারণে অবাঞ্ছিত, অপ্রত্যাশিত কথাবার্তা এমনিতেই মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। আর সেখান থেকেই শুরু হয়— ঝগড়াঝাটি, মারামারি, খুন-খারাবি ইত্যাদি। এই রাগের অশুভ পরিণতিতে ঝরে পড়ে কত প্রাণ, নষ্ট হয় কত ধন-সম্পদ। শুধু তাই নয়—মামলা-মোকদ্দমার বেড়াজালে আটকে পড়ে হারাতে হয় মনের প্রশান্তি।

রাগ নফসের এমন ব্যাধি, যা আপনাকে সফলতার মঞ্চ থেকে টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে দিবে। এমনকি, আপনার সুখি সংসারেও বয়ে আনবে অশান্তির ঝড়। আর তাছাড়া, রাগ নষ্ট করে আমাদের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এজন্য, এই রাগকে নিয়ন্ত্রন করা আমাদের ওপর আবশ্যক। নয়তো, এই রাগ আমাদের নিমজ্জিত করবে অধঃপতনের অতল গহ্বরে।

রাগ এমন এক ব্যাধি, যা মানুষের জ্ঞান'কে হ্রাস করে। কেননা, রাসুল সা. বলেছেন - الغضب يأكل العقل অর্থাৎ:" রাগ মানুষের জ্ঞানকে খেয়ে ফেলে"। তাহলে আপনিও কি চান, রাগ আপনার জ্ঞান'কে খেয়ে ফেলুক? আপনিও কি চান—আপনার অর্জিত জ্ঞানটুকু রাগের কারণে লোপ পাক? আপনি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন—যারা সবসময় রাগারাগি করে, তাদের অধিকাংশই জ্ঞানহীন। রাগারাগি করতে করতে এক পর্যায়ে তাদের আকল লোপ পায়। তাদের বিবেক বুদ্ধি অচল হয়ে পড়ে। যার ফলে সঠিক

সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তো পারে-ই না; এমনকি সহজ বিষয়েও পুরো গোলমাল পাকিয়ে বসে।

কোনো এক বিষয় নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হলে, কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা আপনাকে দলিল এবং যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবে—প্রকৃতপক্ষে তারাই হচ্ছে জ্ঞানী। আবার কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা দলিল এবং যুক্তি পেশ করে সমস্যার নিরসন করতে না-পেরে, আপনার সাথে রাগারাগি করবে। কটু কথা বলবে। একপর্যায়ে আপনাকে গালাগালি করবে, তবু তার ভুল স্বীকার করবে না। তারাই হচ্ছে ওই লোক, যাদের জ্ঞান'কে 'রাগ' খেয়ে ফেলেছে। যারা দলিল এবং যুক্তি পেশ করে সমস্যা নিরসন করতে পারে না; আবার নিজের ভুলও স্বীকার করে না, তারাই ঐ সকল লোক, যারা স্বীয় জ্ঞান'কে বিক্রি করেছে রাগের কাছে।

এক ব্যক্তি শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহি.) -এর সন্তানকে জিজ্ঞেস করল, এই যুগের সবচে' বড় আল্লাহ'র ওলি কে? তিনি বললেন মসজিদে গিয়ে দেখুন, মসজিদের এক কোণে তিনজন ব্যক্তি ইবাদতে মশগুল। আপনি তাদের কাছে গিয়ে এক-এক করে প্রত্যেকের গালে একটি করে চড় দিবেন। তারপর আমার কাছে ফিরে আসবেন।

ওই ব্যক্তি তার কথামতো মসজিদে গিয়ে প্রথম ব্যক্তির গালে ঠাস করে একটি চড় বসিয়ে দিল। তখন ঐ ব্যক্তি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল। সেও পাল্টা তার গালে একটি চড় বসিয়ে দিল। তারপর সে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। তার গালে জোরে একটা চড় বসাল। তখন ওই ব্যক্তি মাথা তুলে তার দিকে তাকাল এবং মাথা নিচু করে আবার ইবাদতে মশগুল হয়ে গেল। সর্বশেষ, সে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। তার গালেও একটা চড় বসাল। তখন ওই ব্যক্তি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল এবং তার হাত ধরে বলতে লাগল—ভাই, আপনি আমাকে মেরেছেন, আপনি হাতে ব্যাথা পাননি তো?

ওই ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহি. -এর ছেলের কাছে ফিরে আসল। অতঃপর ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনাটি তার কাছে বর্ণনা

করল। তখন তিনি জবাবে বললেন, ওই তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে বর্তমান যুগের সবচে' বড় ওলি।

রাগ হচ্ছে নফসের অস্ত্র। এই রাগকে ব্যবহার করেই নফস আপনাকে আমাকে বিভিন্ন জায়গায় ছোট করছে, আপনাকে আমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করছে। তাই, যদি মহৎ ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চান, তবে নফসের ওপর লাগাম দিয়ে, রাগকে সংযত করুন।

দুই

রাগ নেই, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এক সাহাবি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে অল্প কথায় কিছু নসিহত করুন।' তখন রাসুল (সা.) বললেন, 'রাগ বর্জন করো।' সাহাবি কয়েকবার বললেন, 'আরও নসিহত করুন।' কিন্তু, প্রত্যেকবারই রাসুল (সা.) বললেন, 'রাগ বর্জন করো।'

রাগ নিয়ন্ত্রণ—সুখের চাবিকাঠি; সংসারের আলোর প্রদীপ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহি. -এর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলেন। যখন দাফনের সময় হলো, তিনি বলে উঠলেন,'হে উম্মে আবদুল্লাহ! তোমার কবর শান্তিময় হোক। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের বৈবাহিক জীবনে আমাদের মধ্যে একবারও ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।'

এ-কথা শুনে তার এক ছাত্র অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ইমাম ! এটা কীভাবে সম্ভব?'

জবাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহি. বললেন,'যখনই আমি তার প্রতি রেগে যেতাম, তখন তিনি চুপ থাকতেন, আর যখন তিনি আমার প্রতি

রেগে যেতেন, তখন আমি চুপ থাকতাম। তাই আমাদের মধ্যে কখনোই ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।'[২১]

রাগ মানবিক আবেগের অংশ বিশেষ। রাগ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে অনিয়ন্ত্রিত রাগ মারাত্মক ক্ষতিকারক। জ্ঞানীরা বলেন, রাগ হলো বারুদের গুদামের মতো। আগুনের স্ফূলিঙ্গের ছোঁয়ায়, সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে এই রাগ। এ- কারণে রাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কোনো কোনো মানুষ দ্রুত রেগে যায় এবং তাদের রাগও প্রচন্ড। এমনকি, মানুষ রেগে গিয়ে গালিগালাজ শুরু করতে পারে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও বাদ দিতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিরা রাগের কারণে নানা দৈহিক রোগেও আক্রান্ত হতে পারে।

শরিয়ত মানুষকে রাগ নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছে। রাগ মানুষকে জ্ঞান, বিবেক ও ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। রাগের কারণে মানুষের আচার-আচরণ ও চিন্তা-চেতনায় খারাপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই, রাগান্বিত অবস্থায় ক্ষমা করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে শরিয়ত। বিশেষ করে কোনো ব্যক্তি যদি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকার পরও প্রতিশোধ না নেয় এবং ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তার এ কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, বড় বড় মনিষীরা ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী। তারা রাগান্বিত হলে সূরা আল ইমরানের ১৩৪ নম্বর আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন।

মহান ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ ব্যক্তিরা সব সময় অন্যের জন্য দুআ করেন। মানুষকে সংশোধন করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন

---

[২১] আল ইলমু ওয়াল ওলামা- ৩৩৬

জানান। তাদের কথা হলো, কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব আপনার ওপর রেগে থাকলে ক্ষুব্ধ লোকটির কাছে গিয়ে নম্রভাবে তাকে সান্ত্বনা দিন, তার ক্ষোভ উপশমের ব্যবস্থা করুন, যাতে সে শান্ত হয়। এমনটি করলে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিটির ক্ষোভ কমবে, তার কোনো ক্ষতি করার পরিকল্পনা থাকলে তা থেকে সরে আসবে।

বস্তুত রাগ মানুষের জীবনকে সহজেই বিষাক্ত করে তুলতে পারে। রাগের মাথায় এমন সব কাজ ঘটে যেতে পারে—যা ব্যক্তি, সমাজ তথা গোটা বিশ্বের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। তাই রাগ হলে বেশি বেশি 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়তে হবে। রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাসুল সা. আমাদেরকে উত্তম নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তা হলো—যদি হঠাৎ করে রাগ উঠে যায়, তাহলে বসে পড়ো। এরপরেও যদি রাগ প্রশমিত না হয়, তাহলে শুয়ে পড়ো। এরপরেও যদি রাগ কন্ট্রোল করতে তুমি ব্যর্থ হও, তখন অজু করে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করো, ইনশাআল্লাহ রাগ এমনিতেই কমে যাবে।

কিছু কথন

- রাসুল সা. বলেছেন—'সে প্রকৃত বীর নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়; বরং সেই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' এখন ভেবে দেখুন তো—আপনি কি সেই বীরের কাতারে পড়েন? কখনো নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে রাগকে প্রশমিত করতে পেরেছেন? যদি না পারেন, তাহলে কেন এতো দাপট? কেন নিজেকে বীর মনে করেন?

- রাসুল সা. বলেছেন— নিশ্চয় রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তান আগুনের তৈরি। নিশ্চয় পানির দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয় সে যেন অজু করে। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাসুল সা. কত সুন্দর সমাধান দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও, কেন আজ রাগ নিয়ন্ত্রণে পরাজিত?

- আপনি কি জানেন? এক মিনিট রাগ করার কারনে কয়েক ঘণ্টা সুখের সময় হারাতে হয়? রেগে থাকলে এমনি মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে। যার কারণে কোনো কিছুই স্বাভাবিক থাকে না। কটু কথা তো বিরক্ত লাগেই, পাশাপাশি ভালো কোথাও বিরক্ত লাগে।

- মনে রাখবেন—রেগে গিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় না। রাগের কারণে কিঞ্চিৎ সমস্যাও বৃহৎ আকার ধারণ করে। ফলে, ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধানের দ্বারও রাগের কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়।

- রাগের কাছে নিজের সফলতা বিক্রি করবেন না। মনে রাখবেন—যারা সফল হয়েছে, তারা রাগকে সংযত রেখেই সফল হয়েছে। অতি রাগ, সফলতার জন্য প্রতিবন্ধকতা।

- আপনি কি জানেন, রেগে গিয়ে নিজেই নিজের শরীরে বিষ প্রয়োগ করছেন? রাগ হচ্ছে একধরনের বিষক্রিয়া, যা আপনার নফসের জন্য খুবই ক্ষতিকর। নফস অধিকাংশ সময়, রাগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

- কেউ একজন বলেছিলেন— 'যদি একটি রাগের মুহূর্তে আপনি ধৈর্য ধরেন, তাহলে আপনি ১০০ দিনের দুঃখ থেকে মুক্তি পাবেন।'

- আপনার মেজাজ ঠিক রাখুন। রাগের মাথায় হুটহাট কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না; অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

- রাগ এমন এক বাতাস, যা মনের প্রদীপকে নির্বাপিত করে। ফলে, অন্তর ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন ভালো কিছু অনুধাবন করতে পারদর্শী ব্যক্তিও অক্ষম হয়ে যায়।

- রাগ করে কার কী ক্ষতি করেছেন? রাগ করে কাকে কোন শাস্তি দিয়েছেন? কাউকেই নয়; কেবল নিজেকে ছাড়া। রাগ করে অন্যকে শাস্তি দেয়া যায় না। রাগ তো নিজের জন্যই শাস্তিস্বরূপ।

নফসের ব্যাধি: ৩

| গীবত |

এক

নফসের এক অন্যতম ব্যাধি হচ্ছে, গীবত। গীবত নফসে আম্মারাহ -এর খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু! নফস, অন্যের গীবত করতে খুবই পছন্দ করে। গীবত বলা হয়: কারো অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা, যা শুনলে সে কষ্ট পাবে।

গীবত করার পিছনে কিছু কারন সমূহ:

মানব প্রবৃত্তির কাছে গীবত খুবই মজাদার! মজাদার হওয়ার কয়েকটি কারণ....

১| নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বিরক্তিকর। তাই, অন্যের অগোচরে তার দোষ চর্চা করে, নিজের দোষ মস্তিষ্ক থেকে যেন সরিয়ে নেয়া যায়।

২| নিজের সুনাম ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহজ উপায়, গীবত। কেননা, সরাসরি কেউ তার নিজের প্রশংসা, নিজের বড়ত্ব, অন্যত্র প্রকাশ করতে পারে না।

আর তাছাড়া, নিজের বড়ত্ব নিজে বলে বেড়ানো অনেকটা দৃষ্টিকটু। তাই ঐ ব্যক্তি নিজের প্রশংসা নিজে না করে, অন্যেদের গীবতের মাধ্যমে সহজেই প্রমান করে—সকলেই দোষযুক্ত; আমি কত ভালো!

নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করতে, অন্যকে ছোট করতে— অনেকেই এই ধরনের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একে অপরের গীবত করে থাকে।

নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করতে অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। অথচ, এইক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাকে পছন্দ করেন, কাকে ভালোবাসেন—আমরা কেউ বলতে পারি না। আবার, কার কোন একটি আমল আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে, তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে, তাকে প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে ফেলেছেন—সেটাও আমরা জানি না! তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তিকে আমরা ছোট বা হেয় করতে পারি? যাকে হেয় করতে যাচ্ছেন, সেই ব্যক্তি যদি রবের প্রিয় বান্দা হয়ে থাকে, তাহলে নিজের অবস্থা কী হবে—একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। তাই, কাউকে ছোট করার মানসিকতাই রাখা ঠিক নয়। কেননা, এটা গীবতের উৎস।

দুই

হিংসা-বিদ্বেষের তাড়নায় অনেকেই অন্যের গীবতে জড়িয়ে পড়ে। কারো উন্নতি বা প্রশংসা দেখলেই তৃতীয় পক্ষের কাছে তার অগোচরে দোষ চর্চা করে। শুধু তাই নয়—ব্যক্তিজীবনের অনেক গোপনীয় কথাও অন্যত্র প্রকাশ করে দেয়, যেন ঐ ব্যক্তিকে ছোট করা যায়। অনেকেই আছে, যারা সব সময় বেহুদা কাজে সময় ব্যয় করে; সব সময় অবসর সময় কাটায়, তারাই অন্যের গীবতে সিদ্ধহস্ত। কারণ, তাদের কোনো কাজ থাকে না। সময় কাটানোর মাধ্যম হিসাবে তারা ঐ নোংরা পথকেই বেছে নেয়।

তাইতো বলা হয়—গীবত থেকে বেঁচে থাকতে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকো; আড্ডাবাজি পরিহার করো।

|| গীবতের প্রকারভেদ ||

১. দৈহিক কাঠামোর গীবত :

কারো কাছে কোনো ব্যক্তির দৈহিক ত্রুটি উল্লেখ করাও গীবত। যেমন: অমুক ব্যক্তি খুব মোটা, তার নাক বোঁচা, চোখ খুবই ছোট, চোখে দেখে না, মাথায় চুল নেই, পেটে ভূড়ি আছে, ইত্যাদি।

আজকাল এটাকে আমরা গীবত-ই মনে করিনা। একজন মানুষের অগোচরে, তার শারীরিক গঠন নিয়ে কত যে মন্তব্য করি— তার ইয়ত্তা নেই। অথচ, এটাই অনেক বড় ধরনের গীবত; কেননা, আপনি যদি তার উপস্থিতিতে, তার সামনা সামনি এই কথাগুলো বলেন তাহলে অবশ্যই সে কষ্ট পাবে। সেজন্যই তো আপনি তার অনুপস্থিতিতেই অন্যের কাছে তার শারীরিক গঠন নিয়ে আলাপ করলেন।

২. পোশাকের গীবত :

যেমন: অমুকের পোশাক কত সস্তা, অমুকের পোশাক খুবই বিশ্রী। দেখ, দেখ, কেমন একটা জামা পড়েছে। সব সময় ছেঁড়া জামা পড়ে, ইত্যাদি।

৩. বংশের গীবত :

তুচ্ছ করার জন্য কাউেক বলা, অমুকের বংশ নিচু, অমুকের পূর্ব পুরুষেরা ছিলো—কূলি-মজুর বা চোর-ডাকাত ইত্যাদি! অমুকের তো কোনো বংশই নেই, ইত্যাদি বলা।

৪. অভ্যাস বা আচার-আচারণের গীবত :

কোন ব্যক্তির আচার-ব্যবহার নিয়ে সমালোচনা করা।যেমন: সে মানুষকে কষ্ট দিয়ে কথা বলে, ব্যবহার খারাপ, অভদ্র, পেটুক, অলস, ইত্যাদি।

৫. ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে গীবত :

কোনো ব্যক্তির অসহায় অবস্থা অভিনয় বা ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেখানো। যেমন: অন্ধ, বোবা, ইত্যাদি সেজে দেখানো। এমনকি সমালোচনার জন্য কারো চালচলন, কথা, পোশাক ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করাটাও গীবত। সরাসরি নামোল্লেখ না করে এমন কিছু ইঙ্গিতবহ উপমা ব্যবহার করে দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমা শুনেই বুঝে ফেলে কার কথা বলা হচ্ছে।

অর্থাৎ গীবত করার সময় নাম না নিলেও এমন ভাবে কোন ব্যাক্তির দোষ-ত্রুটি বলা যে, মানুষের আর বুঝতে বাকি থাকে না—কার কথা বলা হচ্ছে। এটাও গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত।

৬. কানের গীবত :

নিজে না-বললেও কারো গীবত শোনা এবং শোনার সময় কোনরূপ বাধা না-দেয়া—এটাই কানের গীবত।

৭. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গীবত :

নিজের হাত, পা, চোখ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্য লোকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা। যেমন: কোনো ব্যক্তি কোনো মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চোখ অথবা হাতের ব্যবহার করা।

৮. লেখনীর মাধ্যমে গীবত :

কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মেসেন্জারে তৃতীয় পক্ষের কাছে তার দোষ লিখে মেসেজিং করা। কারো ব্যক্তিগত কথপোকথন স্ক্রিনশট নিয়ে অন্যদের সাথে শেয়ার করা।

এ- গীবত আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু হলেই সঠিকটা যাচাই-বাছাই না-করেই মেসেঞ্জারে একে অন্যের দোষ বর্ণনা করি! ম্যাসেঞ্জারের ব্যক্তিগত কথাবার্তা স্ক্রিনশট দিয়ে অন্যদের সাথে শেয়ার করি—এগুলোও গীবত।

৯. দাওয়াতে লিপ্ত এক মুসলিম অন্য মুসলিমের গীবত। আজ মাঠে কাজ করা অধিকাংশ দাঈ -রা একজন আরেকজনের গীবতে ব্যস্ত। ফলে, ব্যক্তির ক্ষতি যতটা হচ্ছে, তারচে দাওয়াতের ক্ষেত্র বেশী নষ্ট হচ্ছে। সাধারন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। দলাদলি বেড়েই চলেছে। এই ফাঁকে ইসলামের শত্রুরা দীনের ক্ষতি করার আরো বেশি সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে।

॥ গীবতের পরিণতি ॥

গীবতের পরিণতি প্রসঙ্গে হাদীসে কুদসীতে এসেছে : নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দাকে তার আমলনামা খোলা অবস্থায় দেয়া হবে। সে তাতে এমন কতগুলো নেকী দেখবে, যা সে আমল করেনি। সে বলবে,'হে প্রভু! আমি এই নেকীগুলো অর্জন করিনি।' তিনি বলবেন, 'লোকেরা তোমার নিন্দা করেছিল, তারই বদলে আমি এগুলো লিপিবদ্ধ করেছি।' অপর এক বান্দার সামনে কিয়ামতের দিন তার আমলনামা খুলে দেয়া হবে। সে বলবে,' হে প্রভু! আমি কি অমুক দিন অমুক পুণ্য করিনি? তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি লোকদের নিন্দা করতে। ফলে সে-সব পুণ্য তোমার আমলনামা হতে মুছে ফেলা হয়েছে।'

গীবত থেকে বাঁচার জন্য আজ শুধু এতটুকু জেনে নিই—গীবত ও পরনিন্দার শাস্তি কত কঠিন...

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: মে'রাজের সময় আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের ছিল তামার নখ। সেই নখ দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা এবং বুক ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি বললাম, জিবরীল! এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যারা (দুনিয়াতে) মানুষের গোশত খেত (গীবত করত) এবং মানুষের সম্মান হানি করত।[২২]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ স্বভাবের নিন্দা করে বলেন...

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

অর্থ: দুর্ভোগ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির, যে পেছনে ও সামনে মানুষের নিন্দা করে।[২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন....

---

[২২] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৮

[২৩] সূরা হুমাযাহ, : ১

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[২৪]

কিছু কথন

- গীবত করে কোনো ফায়দা নেই; ক্ষতি ছাড়া। ইসলামের অন্যতম স্কলার, হাসান আল-বাসরী রহি. যখন শুনতেন কেউ তার গীবত করেছে, তখন তিনি তার বাসায় মিষ্টি খেজুর পাঠাতেন। অতঃপর বলতেন, 'আপনি আপনার নেক আমল গুলো আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন, এর বিনিময় দেয়া আমার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়, তাও আমি আপনাকে সামান্য হাদিয়া দিলাম!'

- গীবত করে কখনো খালি কলসি ভরাট করা যায় না; উল্টো, ভরা কলসি গীবতের দ্বারা খালি হয়ে যায়। তাই, নিজের কলসি'র পানি দিয়ে অন্যের কলসি ভরাট করো না। অন্যথায়, দুনিয়ায় এতো পানি বহন করেও, ময়দানে মাহসারে খালি কলসি নিয়ে দৌড়াতে হবে।

- ইবনে মুবারক রাযি. বলেন—আমি যদি গীবত করতাম, তবে অবশ্যই আমি আমার মাতা-পিতার গীবত করতাম। কেননা, তারাই আমার নেকী পাওয়ার অধিক হকদার!

- সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহি. বলেন: গীবত ঋণের চেয়েও মারাত্মক। ঋণ পরিশোধ করা যায়; কিন্তু গীবত পরিশোধ করা যায় না।

- আজ হয়তো বিভিন্ন মজলিসে বসে কারো মুখ থেকে তার অনুপস্থিত কারো গীবত শুনছি, আর বেশ মজা নিচ্ছি। আরে, যে আপনার সম্মুখে অন্যের সমালোচনা করে, সে তো আপনার সমালোচনা অন্য

---

[২৪] সূরা হুজরাত, আয়াত - ১২

কারো কাছেও করে। কেননা, গীবতকারী কখনো একের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; মজলিস পেলেই সেখানে গীবতের আসর বানায়। হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে গীবত করে যায়।

➤ গীবত থেকে বেঁচে থাকতে, কোন মজলিসে অন্য কারো সম্পর্কে আলাপ না করে, নিজের সম্পর্কে বা কোনো কল্যানমূলক কাজের আলাপ করুন। কুরআন হাদীসের শিক্ষা নিয়ে আলাপ করার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকুন।

➤ যত কম কথা বলা হবে, ততই গীবত করা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাছাড়া, চুপ থাকাটাও এক ধরনের ইবাদত। এজন্যই বলা হয়—কম ঘুমাও,কম খাও, কম কথা বলো। বেশি কথা বলা গীবতের দরজা তো খুলেই, পাশাপাশি নিজের বিপদও টেনে আনে।

➤ গীবতের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখুন, তাহলে আখেরাতের ভয়াবহতা ও দুনিয়ায় লাঞ্চিত হওয়ার ভয়ে নিজেকে গীবত থেকে সংযত রাখা যাবে।

➤ সবসময় নিজের দোষ-ক্রুটি নিয়ে ভাবুন। কেননা, নিজের ক্রুটির কথা স্মরণ থাকলে, অন্যের চেয়ে নিজেকেই ছোট মনে হবে এবং অন্যের সমালোচনা করার কথা মাথায়ও আসবে না।

➤ নবী রাসূলদের জীবনী পড়ুন। এতে দুনিয়ার জীবনের লোভ-লালসা, হিংসা, রাগ থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার আগ্রহ আসবে ইন শা আল্লাহ।

➤ আখেরাতের জীবন ও দুনিয়ার জীবন নিয়ে তুলনামূলক জ্ঞান অর্জন করুন। এর ফলে আখেরাতের জীবনে প্রাধান্য আসবে। সেই সুবাদে গীবত নামক ব্যাধি থেকেও সতর্ক থাকা যাবে।

➤ বেশি বেশি রবের কাছেই দু'আ করুন, যেনো আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাকে এই ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখেন!

নফসের ব্যাধি: ৪

| লোভ |

নফসের আরেকটি ব্যাধি হচ্ছে লোভ। লোভ মানুষকে একদম অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে। একজন লোভী মানুষ কখনো সুখী হতে পারে না। সুখের সমস্ত দ্বার, লোভ নামক ব্যাধি পরিপূর্ণভাবে রুদ্ধ করে দেয়; তার জীবন থেকে সুখ কেড়ে নেয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাআলা যে-সকল নেয়ামত তাকে দান করেছেন, তার শুকরিয়া তো কখনো আদায় করেই না; উল্টো আল্লাহ তাআলা তাকে যা দান করেছেন, তার চে বেশী কিছু আকাঙ্ক্ষা করে। এমনকি, যদি সেটা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে আবার নতুন করে ভিন্ন কিছু চাইতে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ: একজন ব্যক্তি পায়ে হেঁটে দৈনিক তার কর্মস্থলে যায়। যাওয়ার পথে তার দৃষ্টিগোচর হয়—অনেকেই সাইকেল ব্যবহার করে তার কর্মস্থলে যাচ্ছে। যখন সে এটা দেখে, তখন মনে মনে সাইকেল আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। বলতে থাকে—'অবশ্যই আমার একটা সাইকেল চাই। এটা পাওয়ার জন্য যা কিছু করতে হয়, আমি তাই করবো।' এখান থেকেই তার লোভের যাত্রা শুরু। সে পায়ে হেঁটে তার কর্মস্থলে যেতে পারে এটাই তো অনেক কিছু। এরকম অনেক মানুষ রয়েছে, যারা হাঁটতে পারে না; যাদের পা নেই। এদিকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পা দিয়েছেন, সেই পায়ে হেঁটে হেঁটে তার গন্তব্যস্থলে যেতে পারছে। এতদ্বসত্ত্বেও, তার রবের শুকরিয়া জ্ঞাপন না করে, আরো বড় কিছু আকাঙ্ক্ষা করে বসলো। সাইকেল কেনার জন্য যা যা করা লাগে, সে তাই তাই করল। যখন সে সাইকেল কিনলো, তখন সে বাইক দেখে সেটার দিকে মনোনিবেশ করল। এবার সে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো, এবার সাইকেল রেখে বাইকে করে কর্মস্থলে যাবে।'

অতঃপর সে বাইকও ক্রয় করে। এভাবে দিন দিন তার লোভের মাত্রা বাড়তেই থাকে। একটার পর একটা চাইতেই থাকে। যা পেয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। যা আছে তার কখনো শুকরিয়া আদায় করে না। লোভ করতে করতে এক পর্যায়ে তার আকাঙ্ক্ষা তার সামর্থের বাইরে চলে যায়। তার আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী; কিন্তু তাঁর সামর্থ্য শেকলবন্দি। এমতাবস্থায় যখন সে তার সামর্থ্য দ্বারা তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না, তখন সে অসামাজিক কাজে আত্মনিয়োগ করে। অর্থের জন্য, হারাম পথ বেছে নেয়। যা তার দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই ধ্বংস করে।

এভাবেই চলতে থাকে জীবন; চলতে থাকে তার লোভের চক্র। লোভ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন এই লোভের চক্র থেকে বের হয়ে আসা, তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে যায়। ফলে, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থেকেও সে আকাঙ্ক্ষা করে—আমার মৃত্যুটা যেন জাঁকজমকপূর্ণ হয়, মৃত্যুর সংবাদে যেন মানুষের ঢল নেমে আসে; জানাযা যেন লাখো মানুষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়।

লোভী ব্যক্তি ধন-সম্পদ অর্জন করে ক্রয় করে: নফসের কষ্ট, ব্যস্ত অন্তর, পরকালের শক্ত হিসাব। আর একজন শুকর গুজারি দারিদ্র ব্যক্তি ক্রয় করে: নফসের শান্তি, মুক্ত স্বাধীন অন্তর, পরকালের সহজ হিসাব।

অসংখ্য রেওয়ায়েত লোভের নিন্দায় বর্ণিত হয়েছে। যার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি বনি আদমের স্বর্ণ ভরা একটা উপত্যকা থাকে, তথাপি সে তার জন্য দু’টি উপত্যকা হওয়ার কামনা করবে। তার মুখ মাটি ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভরবে না। তবে যে ব্যক্তি তাওবাহ করবে, আল্লাহ্ তার তাওবাহ কবুল করবেন।[২৫]

---

[২৫] সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৩৯

ইমাম সাদিক রহি. বলেছেন : ‘লোভী দু'টি উৎকৃষ্ট গুণ হতে বঞ্চিত, ফলশ্রুতিতে সে দু'টি দোষের অধিকারী; সে পরিতৃপ্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত ফলে প্রশান্তিকে হাতছাড়া করেছে, [আর] সন্তুষ্টি হতে বঞ্চিত ফলে বিশ্বাসকে খুইয়েছে'।

ইমাম আলী রহি. বলেছেন : ‘সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ধনি যে লোভের বন্দি নয়'।

ইমাম সাদিক রহি. বলেছেন : আমিরুল মু'মিনীন বলতেন যে, হে আদমের সন্তানেরা! যদি তুমি দুনিয়া হতে পরিমাণ মতো চাও, তাহলে সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যদি পরিমাণের চেয়ে বেশী চাও, সমস্ত দুনিয়াও তোমার জন্য যথেষ্ঠ নয়'।[২৬]

প্রয়োজনের বেশি ধারণ ক্ষমতার বাইরে মানুষ খেতে পারে না, পড়তে পারে না, করতে পারে না—এসব জানা সত্ত্বেও মানুষ অতিরিক্ত পাওয়ার নেশায় কত রকম ধান্দার পেছনে যে জীবন নষ্ট করে দেয়, তা আমাদের চারপাশের মানুষজনকে দেখলেই বোঝা যায়।

লোভ-লালসা হচ্ছে মানুষের হীনতম বৈশিষ্ট্যের একটি। ভাই-বোনের মধ্যে ধন-সম্পদ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, সম্পর্ক নষ্ট। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ এবং পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে মামলা-মোকাদ্দমা ইত্যাদি, এ-সবকিছু লোভের-ই ফসল।

কিছু পাপ আছে, যা শুধুই মৌলিক পাপ, আর লোভ, হিংসা, অহংকার এমন ধরনের পাপ যা আরো বহু পাপের জন্ম দেয়।

---

[২৬] আল কাফী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১৬, হাদীস নং ৭

নফসের ব্যাধি: ৫

| হিংসা |

নফসের রোগসমূহের মাঝে অন্যতম একটি রোগ হচ্ছে হিংসা। হিংসা, নফসের এক অনন্য ব্যাধি। হিংসুক, হিংসার কারণে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। কারো কোনো গুণ তার সহ্য হয় না। এজন্য, কারো ভালো কিছু দেখলেই তার শত্রুতে পরিণত হয়। শত্রুতা করাই তার কাজ। হিংসা এমন এক রোগ, যা সুস্থ মানুষের মন বিগড়ে দিতে দেরি করে না। গীবতের প্রভাবে তার মধ্যে বিবেক বলতে কিছুই থাকেনা। হিংসা আজ মহামারি আকার ধারণ করেছে। সমাজে কেউ কারো উন্নতি সহ্য করতে পারে না। অন্যের উন্নতি দেখে হিংসার আগুনে জ্বলে ছারখার হয়ে যায় তার বিক্ষিপ্ত অন্তর।

এই হিংসা'র গল্পটা মানব সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকেই। যেমন: আদম আ. -কে সৃষ্টি করার পর ইবলিস যখন আদম আ. -এর গুণ দেখতে পেল, তখনই সে তার শত্রু হয়ে গেল। হিংসা থেকেই সে বলল, আনা খাইরুম মিনহু। আমি তার চেয়ে উত্তম। আবার ইউসুফ আ. -এর ভাইয়েরাও হিংসা করেছিল, তার উপর। ইউসুফ আ. -এর ভাইয়েরা যখন দেখল, ইউসুফ তাদের পিতার কাছে প্রিয় সন্তান, তখনই তারা হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। অবশেষে তারা হিংসার আগুনে জ্বলে ইউসুফ আ. -কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। যেন, তাদের পিতা শুধুমাত্র তাদের দিকেই দৃষ্টি নিবিষ্ট করেন।

হিংসা প্রত্যেকের ভেতরেই রয়েছে। হিংসা ছাড়া কোনো মানুষ নেই। কারো ভিতরে কম, কারো ভিতরে বেশি। তবে, প্রকৃত মুসলিম, প্রকৃত দীনদার, কখনো হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই আমাদের উচিত নিজের হিংসার সত্তাকে সংযত রাখা। আর, অন্য কেউ যদি আপনার আমার ওপর হিংসা

করে। আপনার উন্নতিতে আপনার সফলতায় তার জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়, তখন ঘাবড়ে যাবেন না। আপনার ভেতর যখন গুণ থাকবে, তখন লোকেরা আপনাকে হিংসা করবে—এটাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই; বরং কেউ হিংসা করলে আপনার খুশি হওয়া উচিত। কেননা, যে কারণে আপনি হিংসুকের হিংসার পাত্র হয়েছেন, সেই কাজে আপনি পারদর্শী। আপনার মধ্যে সেই যোগ্যতা, সেই গুন আছে বলেই সে আপনাকে হিংসা করেছে। মোটকথা, হিংসুকের হিংসা আপনার দক্ষতার পরিচায়ক। মনে রাখবেন—যার মধ্যে যে গুণের শূন্যতা, সে-ই উক্ত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে সহ্য করতে পারে না। যার মধ্যে যে গুণের অভাব, সে গুনের অভাবেই সে হিংসার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। মনে রাখবেন—কোনো এক প্রহর হিংসুকের হিংসা থেকে মুক্ত থাকা আপনার জন্য দুঃসংবাদ। কেননা, নিকৃষ্ট মানুষকে কেউ হিংসা করে না; হিংসা তো করে সর্ব গুণে গুণান্বিত কোনো এক সফল ব্যক্তির।

এজন্য সবার জন্য উচিত, হিংসা না করে নিজেকে এমন ভাবে গড়ে তোলা, যেন অন্যরা সবাই আপনাকে হিংসা করতে পারে। হিংসুটে না হয়ে হিংসার পাত্র হওয়ার চেষ্টা করুন। নফস আপনাকে হিংসুটে বানাতে চায়; হিংসার পাত্র নয়। এজন্য, নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে হিংসুটে না হয়ে, হিংসার পাত্র হতে হবে।

এবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন—আমাদের মধ্যে এই শিক্ষাগুলো কতটুকু আছে? অন্যের দিকে না তাকিয়ে প্রত্যেকে যার যার অবস্থা যাচাই করুন। আমরা আজকাল সবাই কি একটু বেশিই হিংসুটে হয়ে যাচ্ছি না? এমন হিংসুটে ভাব কেন? অন্যের ভালোটা সইতে এত কষ্ট হয় কেন? তার কারণ হচ্ছে—আমরা আজ নফসের কাছে পরাজিত। আজ নফসের দাসত্বে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছি। সাথে সাথে ঈমানের মূল মর্ম আমরা হারিয়ে ফেলেছি। মগজহীন খোসা নিয়ে বেঁচে আছি আমরা। অথচ,ঈমান নিয়ে কবরে যেতে হলে আমাদের স্বভাব পাল্টাতে হবে। বদলাতে হবে নিজেদেরকে। গুণীর গুণের স্বীকৃতি দেয়া শিখতে হবে। কারো ভালো কিছু

দেখে কষ্ট হলে কষ্ট ভেতরেই রাখতে হবে। বাইরে যেন প্রকাশ না পায়। ভেতরে ভেতরে কিছুক্ষণ জ্বলবো। একসময় ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন—লোভ, হিংসা, অহংকার – ধ্বংসের মুল। হিংসা, সর্বপ্রকার উন্নতির অন্তরায়। যে অন্যকে হিংসা করে, সে মনের শান্তি পায় না। হিংসা আত্মার রোগ। বাঙালির দুরারোগ্য অসুখের নাম হলো হিংসা। হিংসা কারো ক্ষতি করতে পারে না; নিজের ছাড়া।

হিংসা অন্যের দিকে লক্ষ্য করে এবং আঘাত করে। এতে করে নিজের মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়। আপনি একই সাথে হিংসুক ও সুখী হতে পারবেন না। কেননা, হিংসা সুখী জীবনের অন্তরায়। হিংসা ও প্রশান্তি কখনই একসাথে থাকতে পারে না। কেননা, হিংসা প্রজ্জ্বলিত আগুনের ন্যায়—যা সর্বদাই তাকে পোড়াতে থাকে।

তাই, আমাদের উচিত সর্বদা হিংসামুক্ত জীবন লালন করা। হিংসাকে দূর করে আত্মিক উন্নয়নের দরজা খুলে দেয়া।[২৭]

---

[২৭] বানু ইসরাইল, আয়াত: ৬২

নফসের ব্যাধি: ৬

| অলসতা |

এক

নফসের আরেকটি ব্যাধি হচ্ছে, অলসতা। নফস হচ্ছে আরাম প্রিয়সী। নফস সব সময় আরাম চায়। এই নফস অলসতাকে কাজে লাগিয়ে আজ আপনাকে আমাকে সর্বপ্রকার ইবাদত থেকে দূরে রাখছে। অলস নফস ফজরের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে আরাম পেতে চায়। রমজান মাসে গরম দূর করতে কোল্ড-ড্রিংকস্ খেয়ে আরাম পেতে চায়। এই অলসতা ইবাদত-বন্দেগির প্রতিবন্ধকতা। যার মধ্যে যত বেশি আলসেমি, তার ইবাদতে ততবেশি ঘাটতি। অলসতার দরুণ, আজ অনেকেই ফজরের নামাজ কাজা করে। অলসতায় বশীভূত হয়ে জামাত তরক করে। অলস ব্যক্তি কখনো সফলতার মুখ দেখতে পায় না। অলস ব্যক্তি ইহকালীন-পরকালীন উভয় জগতেই ব্যর্থ। না দুনিয়াতে কিছু করতে পারে; আর না আখেরাতের জন্য কিছু করতে পারে!

একজন অলস ব্যক্তি আজ তার অলসতাকে প্রাধান্য দিয়ে ইবাদত-বন্দেগী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সে কি জানে? সে শুধু ইবাদত থেকে দূরে যাচ্ছে না; বরং জান্নাতের চির সুখ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? সে কি জানে? অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়ে, সাময়িক সুখের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির কুটির নির্মাণ করছে?

একজন অলস ব্যক্তি রুজি-রোজগার থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। অথচ, হালাল পন্থায় উপার্জন করাও তার ওপর আবশ্যক। কেননা, তার ওপর তার শরীরের একটা হক রয়েছে; তার ওপর তার পরিবারের হক রয়েছে।

যদি অলসতায় বশীভূত হয়ে রুজি-রোজগার হতে হাত গুটিয়ে নেয়, তবে তাদের হক আদায় করবে কীভাবে? তাদের হক আদায় করতে তো পারবেই না; উল্টো পেটের ক্ষুধা মেটাতে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিড়বে। নিজেও ছোট হবে, পরিবারকেও ছোট করবে। নিজেও শান্তিতে থাকবে না, পরিবারকেও শান্তিতে রাখতে দিবে না।

অলসতার কারণ:

একজন মানুষ কেন অলস হয়? কেন তাকে অলসতায় গ্রাস করে নেয়? একজন মানুষ অলস হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে...

১. অলস হওয়ার পেছনে দায়ী হচ্ছে, আমাদের বাবা-মা কিংবা পরিবার। ছোটবেলা থেকেই এমন আদুরে পরিবেশে বাচ্চাদের লালন-পালন করা হয়, যার কারণে পরবর্তীতে সে আর আদুরে পরিবেশ থেকে বের হতে চায় না। ছেলে যদি হাঁটতে চায়, মা বলে,"বাবা, মাটিতে হেঁটো না, পিপড়া কামড়াবে; ওভাবে দৌড়িও না, ব্যাথা পাবে।" বাচ্চা যখন এমনি এমনি আবেগপ্রবণ হয়ে নামাজ পড়তে চায়, তখন বাবা বলে,"বাবা, তুমি এখনো ছোট। ঘুম থেকে ওঠার দরকার নেই; বরং ঘুমিয়েই থাকো। কী দরকার ঘুম থেকে ওঠার ? কী দরকার এই ছোট বয়সে এতো কষ্ট করার?" মা-বাবার ভুল প্যারেন্টিং -এর এমন বহু উদাহরণ রয়েছে।

২. অলসতার আরেকটি কারণ হচ্ছে, সিদ্ধান্তে অটল না থাকা। আমরা হয়তো মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই, আগামীকাল থেকে আর দেরিতে ঘুম থেকে উঠবো না। এখন থেকে প্রতিদিন ফজরের আযানের সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠবো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই ঠিকই, কিন্তু সেটা আর বাস্তবায়ন করি না। অলসতাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিদিন নাক ডেকে ঘুমিয়ে থাকি। ফলে, অলসতা ধীরে ধীরে আমাদের ওপর আরো বেশি ভর করে নেয়।

৩. অলসতার আরেকটি কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা। অজ্ঞতার জন্যও অবশ্য অলসতাই দায়ী। মানুষ যখন কোন কর্মের ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তখন সে ওই কাজ করার জন্য ভালোভাবে প্রচেষ্টা চালাতে চায় না। যেমন: ভিক্ষুক জানে না—পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনে কত শান্তি নিহিত রয়েছে। এখানে অবশ্য, সে ভিক্ষুক হওয়ার জন্য তার অজ্ঞতা এবং অলসতা দু'টোই দায়ী।

দুই

প্রতিদিন একই কাজ করতে আমরা অভ্যস্ত। সেই সাতসকালে কর্মস্থলে যাওয়া আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আরো কত কিছু করার ইচ্ছে, কিন্তু অলসতার কারণে তা আর করা হয় না। ইবাদত-বন্দেগিতেও অলসতা ভর করে। মসজিদে যাব যাব বলে আর যাওয়া হয় না। ফরজ নামাজের পর নফল পড়বো বলে মনস্থির করলেও, ফরজ শেষ করার পর নফলের জন্য দাঁড়াতে আর মন চায় না। তাসবিহ-তাহলিল পড়বো পড়বো বলে আর পড়া হয়না। মোটকথা, অলসতার দরুন কোনো কিছুই হয়ে উঠে না—সম্ভাব্য কাজটুকু অসম্পাদিত রয়ে যায়; সম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা কাজটুকুও অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তাই তো বলা হয়, অলসতা সফলতার প্রতিবন্ধকতা। তাই, যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে, ইবাদত-বন্দেগীতে মন বসাতে অবশ্যই আমাদেরকে অলসতাকে এড়িয়ে যেতে হবে। অলসতা নামক হিংস্র পশুকে ভিতর থেকে বের করতে হবে। কিন্তু, অলসতাকে কীভাবে দূর করবো, কীভাবে অলসতা মুক্ত জীবন যাপন করব—সেটা ভাবতে ভাবতে অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাই। আসুন, এবার জেনে নিই, কীভাবে অলসতাকে দূর করবেন....

১. শুরুটা সহজ কিছু দিয়ে হোক:

এক বছরে ১০০ বই পড়ার ইচ্ছে। এদিকে ১০০ বইয়ের নাম শুনেই ভয়ে কুপোকাত। ফলে শুরুটা আর হচ্ছে না। কাঠিন্যতার ভয় দেখিয়ে অলসতা

সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে। শুরুতেই কঠিন কিছুকে অভ্যাস হিসেবে তৈরি করা বেশ কঠিন। তাই, শুরু করুন সহজ কিছু দিয়ে। নিজের ওপর চাপ না হয় এমন কিছু দিয়ে। যেমন: প্রথম মাসে একটি বই, দ্বিতীয় মাসে দু'টি বই, তৃতীয় মাসে ৫ টি বই—এভাবে ক্রমাগতভাবে মাস অনুযায়ী বাড়াতে থাকবেন। তাহলে এটা খুব সহজেই আপনার মস্তিষ্ক কেচ করবে। অন্যথায়, চাপ মনে করে অলসতা বাসা বাঁধবে।

নেক কাজ, ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও এমনটাই করুন। নফল নামাজের ক্ষেত্রে প্রথমদিন দু'রাকাত দ্বিতীয় দিন চার রাকাত তৃতীয় দিন ছ' রকাত—এভাবে শুরুটা সহজভাবে করে ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকুন। কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম দিন দুই পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় দিন চার পৃষ্ঠা, তৃতীয় দিন ছয় পৃষ্ঠা—এভাবে ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকুন। প্রথম দিনে যদি ১০০ রাকাত নফল নামাজ পড়ার এবং পাঁচ পারা কুর'আন তেলাওয়াত করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে সেটা শুরু করতে অলসতার বাধা আসবে। তাই, শুরুটা স্বাভাবিকভাবে সহজ ভাবে করুন।

২. কাজের গুরুত্ব, প্রয়োজন ও ফলাফল কী হবে, সেটা মাথায় রাখা:

ব্যক্তিজীবন ও কর্মক্ষেত্রে কোনো কাজের গুরুত্ব কেমন তা বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। কাজের প্রকৃতিকে যদি গুরুত্ব ও প্রয়োজন বুঝে কাজ ভাগ করতে পারেন, তাহলে সহজেই অলসতা কাটানো যায়। যেমন: "আপনার কাছে এমন একটি কাজ আসলো, যা করলে আপনি কিছু অর্থ পাবেন। আর ওই অর্থের দিকে আপনার পুরো পরিবার তাকিয়ে আছে।" এটা ভাবলে ওই কাজের গুরুত্ব আপনার বুঝে আসবে এবং এর ফলাফল কী, সেটাও বুঝে আসবে। ঠিক ইবাদতের ক্ষেত্রেও ইবাদতের গুরুত্ব এবং তা আদায় করার পর কী ফলাফল আসবে—তা নিয়ে ভাবুন। যখন শরীয়তের বিধি-বিধান এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন তা সম্পাদনে আগ্রহী হবেন। অতঃপর যখন এর ফলাফল তথা জান্নাত লাভের কথা ভাববেন, তখন অলসতার দরজা এমনিতেই তালাবদ্ধ হয়ে যাবে।

৩. নিয়মে অভ্যস্ত হোন:

কাল সকাল থেকে নিজেকে বদলে ফেলবো। কাল থেকে আর নামাজ ত্যাগ করব না—এমন করে কতই-না অনুপ্রেরণা দিই, কতই-না প্রতিজ্ঞা করি। কিন্তু সময় আসলে সেটা আর বাস্তবায়ন করি না। নিজেকে বদলে ফেলব বলে সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু বদলানোর জন্য চেষ্টা করি না। নিয়মিত নামাজ পড়বো, নামাজ ছাড়বো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই—কিন্তু নামাজের সময় আসলে সেটা আর মাথায় থাকে না। অনেক সময় শুরুটা করি ঠিক, কিন্তু সেটা আর নিয়ম তান্ত্রিক হয় না। একদিন দু'দিন, পরে সেই আগের মতই।

৪. সময়ের কাজ সময়ে শেষ করুন:

আজকে সারাদিন কী কী কাজ করবেন, কী কী আমল করবেন—তা ছোট একটি কাগজে লিখে নিন। অতঃপর, নোট করা সেই কাজগুলো সে-দিনেই সম্পন্ন করুন। আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না। আগামীকালের জন্য ফেলে রাখলেই তা জমা হয়ে যায়। আর জমা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে, অলসতার বাধা আসে।

৫. বই পড়ুন:

বই পড়ার মতন আনন্দ আর কোনো কাজে নেই। ইসলামিক আত্মউন্নয়নমূলক, আত্মশুদ্ধি মূলক বই পড়ুন। বই পড়ার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থেই আপনার আত্ম-উন্নতি ঘটবে। তাই ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অলসতা দূর করতে বই পড়ার অভ্যাস অত্যন্ত সহায়ক।

৬. কল্পনা করুন:

সকালে উঠে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন,আপনি ভবিষ্যতে ঠিক কীভাবে নিজেকে দেখতে চান। আপনার সাফল্যের চিত্রটি ঠিক

কীরকম হবে? সেই বিষয়ে কল্পনা করুন।

কিছু কথন

- অলস ব্যক্তি কিছু না-করার মধ্যে পরিতৃপ্ত হলেও, কিছু না-পাওয়ার কারণে ঠিকই ছটপট করে। এমন নয়—সে কিছু করে না বলে তার কোনো চাহিদা নেই। বাস্তবে, সে চায় ঠিকই, কিন্তু আমল করে না।

- অলস ব্যক্তির কাছে অলসতা কত মধুর, কিন্তু বাস্তবে অলসতা হলো ক্ষুধার্ত সাপের মতো। যা তার টুকটাক চাওয়া-পাওয়া গুলো অলসতা নামক ক্ষুধার্ত সাপ খেয়ে ফেলে।

- অলস ব্যাক্তির জন্য অনুপ্রেরণা হলো এক অতিথি, যে স্বেচ্ছায় তাকে পরিদর্শন করে না। কেননা, অলসকে নিজে থেকে যতই বুঝাতে আসবেন, কোনো লাভ হবে না। আপনি বোঝাবেন, সে বলবে: আমি বুঝতে চাই না।

নফসের ব্যাধি: ৭

| আসক্তি |

এক

• টাকার নেশা:

টাকা ছাড়া জীবন অনেকের কাছেই অর্থহীন। জীবন চলার পথে টিকে থাকতে হলে, টাকার প্রয়োজন। টাকা ছাড়া চলা মুশকিল। টাকা ছাড়া না-পাওয়া যায় খাদ্য, না-পাওয়া যায় বস্ত্র, আর না-পাওয়া যায় বাসস্থান। এজন্য মত্ত হয়ে অর্থ উপার্জনের পিছনে আমরা নিজেকে বিলীন করে দিই। সারাক্ষণ টাকার পিছনে ছুটি। টাকার পেছনে ছুটতে ছুটতে, এক পর্যায়ে ভুলে যাই, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। সাথে সাথে এ-ও ভুলে যাই—কে আমি, আমাকে কেনো সৃষ্টি করা হয়েছে।

টাকা উপার্জন করা আমাদের দায়িত্ব। টাকা ছাড়া চলার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুন্দরভাবে জীবনটাকে পরিচালনা করার জন্য, চাওয়া-পাওয়া গুলো বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন। টাকা উপার্জন করা ভালো; তবে টাকার নেশায় মত্ত হয়ে জীবনের অর্থ ভুলে যাওয়া খুবই ক্ষতিকর। যারা টাকার নেশায় ডুবে গেছে, তারা তো নিজের মধ্যে নিজেই হারিয়ে গেছে। টাকার নেশায় মত্ত হয়ে, নিজের কাছে নিজেকেই বিক্রি করেছে; সুখ নামক শব্দটা জীবনের ডায়েরীর পাতা থেকে মুছে ফেলেছে। অনেকেই বলে, টাকার মধ্যে সকল সুখ নিহিত, আর একজন মুমিন বলে, প্রয়োজনের

অতিরিক্তের মধ্যেই সকল অশান্তি লুকায়িত। তারা টাকা দিয়ে সুখ কিনতে চায়; আর একজন মুমিন রবের হুকুম মেনে সুখি হতে চায়।

একজন প্রকৃত মুমিন টাকা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহের জন্য। তবে, সে টাকার নেশায় ডুবে যায় না। ইতিপূর্বে যারাই টাকার নেশায় আসক্ত হয়েছে, তারাই ধ্বংস হয়েছে। টাকার নেশায় আসক্ত ব্যক্তি সবসময় টাকার পিছনেই ছুটে। আপনি দেখবেন একজন ব্যক্তির অগাধ ধন-সম্পদ রয়েছে, কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স। এতদসত্ত্বেও, সে শুধু সারাদিন টাকার পিছনেই ছুটে, কীভাবে আরো টাকা লাভ করা যায়, সেই চিন্তায় সর্বদাই বিভোর। তারাই হচ্ছে, টাকার নেশায় আসক্ত—যারা কোটি-কোটি টাকা পেয়েও, গরিবের বুকে লাথি মেরে আরো টাকা পেতে চায়।

টাকার নেশা একজন ব্যক্তির জন্য কতটুকু ক্ষতিকর:

১. টাকার পেছনে ছুটতে গিয়ে, পুরো পরিবারের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। সন্তানকে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। স্ত্রীর প্রতি অবহেলা তৈরি হয়। ফলে, স্ত্রী যদি দীনদার না হয়, তখন পরকীয়ার জগতে পা বাড়ায়।

   আমার পরিচিত একজনকে দেখেছি অন্যের স্ত্রীর সাথে প্রেম করতে। যখন তাকে বললাম, 'একেতো হারাম সম্পর্কে জড়িয়েছিস, তার ওপর অন্যের স্ত্রীর সাথে। এক অপরাধের উপর আরেক অপরাধ।' তখন সে বলল,' আর বলবেন না, মেয়েটা আমার জন্য পুরোই পাগল। আমাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না।' আমি যখন তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলাম, তখন সে বলল,' মেয়েটা তার স্বামীর কাছে খুবই অবহেলিত। তার স্বামী সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে; বউয়ের দিকে কোনো নজরই দেয় না। তার হক আদায় করবে তো দূরের কথা; ঠিকমত কথাই বলে না। যার কারণে সে এই পথ বেছে নেয়, আমার সাথে সম্পর্কে জড়ায়।

২. টাকার নেশায় যারা আসক্ত, তারা খুন-খারাবি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। টাকার জের ধরে কত হানাহানি, কত খুনাখুনি।

৩. টাকার নেশায় আসক্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ সময়ই মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জেলে কাটাতে হয়। কেননা, তারা টাকার জন্য যে-কোনো অমানবিক, জঘন্য কাজও বেছে নেয়।

দুই

• নারীর নেশা:

নারীর নেশাও আমাদের জন্য খুবই ভয়ংকর। যারা নারীদের নেশায় আসক্ত, তারা সব সময় শুধু নারীদের পেছনেই ছোটে। কীভাবে তাদেরকে কাছে পাওয়া যায়, কীভাবে তাদের সাথে সম্পর্কে জড়ানো যায়—সেই চিন্তায় সর্বদাই বিভোর। নারীর নেশা চারিত্রিক অবক্ষয় নষ্ট করে। চরিত্রে কালো দাগ এটে দেয়। যারাই নারীদের নেশায় আসক্ত হয়েছে, তারাই ধ্বংস হয়েছে—পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সবার কাছে অপ্রিয় হয়ে, ঘুরে বেড়াতে হয়েছে উদভ্রান্তের ন্যায়।

• পতিতালয় গমনের নেশা:

যারা নিজের নফসের ওপর লাগাম দিতে পারে না, তাদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সারাক্ষণ নফসের গোলামী করে যৌন লালসা নিজের মধ্যে পোষণ করে রাখে—তারাই পতিতালয়ের নিয়মিত কাস্টমার। আর একজন ব্যক্তি যখন পতিতালয়ের কাস্টমার হয়ে যায়, তখন সে আর এটা থেকে বের হয়ে আসতে চায় না। বিয়ের পরেও এই নেশার কাটিয়ে উঠতে পারে না, যতক্ষণ না নিজের নফসের ওপর লাগাম টেনে ধরছে।

• পর্ণ গ্রাফিক্সের নেশা:

পর্ন গ্রাফিক্স যুবকদের জন্য কতটা ভয়াবহ, তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। শুধু এতোটুকুই জেনে রাখুন—জীবন-যৌবন সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে।

• হস্তমৈথুনের নেশা:

এটাতো আরো মারাত্মক নেশা। একবার যে নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়েছে, সে জানে তার জীবনে কী চলছে! বার বার নফস তাকে ধোঁকা দিয়ে বলে, ' এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট'!

এছাড়াও অনেক নেশা রয়েছে যাতে আমাদের আসক্তি তৈরি হয়। আর এই আসক্তি মূলত নফসের এক ব্যাধি।

|| চতুর্থ পরিচ্ছেদ ||

নফস নিয়ন্ত্রণ করতে জরিমানা আরোপ করুন

নফস হচ্ছে অবুঝ বাচ্চাদের মতো। বাচ্চাদের যা ভালো লাগে তারা তাই করে। আর যা ভালো লাগে না তার ধারে কাছেও যায় না। উদাহরণস্বরূপ: বাচ্চারা স্বভাবগত আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। এজন্য, লক্ষ্য করে দেখবেন, কোন একটি বাচ্চা হুট করে পাঞ্জাবি পড়ে ফেলেছে, পাগড়ী মাথায় দিয়ে দিয়েছে, আবার আযান পড়ার সাথে সাথে মসজিদে চলে যাচ্ছে। আবার দেখবেন, কিছুদিন পরে সে মসজিদের ধারে কাছেও নেই। মোটকথা, যখন যা ভাল লাগে তাই করে।

বাচ্চারা যদি মসজিদে আসে, তখন আমরা তাদেরকে সাধারণত উৎসাহ দিয়ে থাকি। বলি—মাশাল্লাহ, এভাবে নিয়মিত নামাজে আসবা। আর যখন সে মসজিদ বিমুখ হয়ে যায়, তখন আমরা তাকে শাসন করি। বলি—মসজিদে যাস না কেন, তোকে যেতে হবে, ইত্যাদি। তো আমাদের নফসটাও এরকম-ই। যখন যা ভাল লাগে তাই করে। কোনো এক দুর্ঘটনায় নফস যখন ভয় পেয়ে যায়, তখন মনে মনে বলে, যাই নামাজ পড়ি। আবার যখন দুর্ঘটনার সেই ভয় নফস থেকে দূর হয়ে যায়, তখন আবার নামাজ ছেড়ে দেয়। মোটকথা, যখন যা ভালো লাগে, তাই করে।

নফসের এই বাচ্চা-সুলভ আচরণ'কে বিলুপ্ত করতে আমাদের উচিত, নফসের ওপর জরিমানা আরোপ করা। যদি আমাদের দ্বারা কোনো গোনাহ সংঘটিত হয়, নেক কাজ ছুটে যায়, তাওবাহ ও ভর্ৎসনা দ্বারাও ঠিক না হয়; বার বার খারাপ কাজে লিপ্ত হতেই থাকে, তখন নফসের ওপর কিছু শিক্ষা মূলক শাস্তি বা জরিমানা আরোপ করা যায়। এতে করে নফস, কিছুটা সোজা হয়ে যাবে। আশরাফ আলী থানুবী রহি. বলেছেন—আপনি যখন নফসের ওপর জরিমানা আরোপ করবেন, তখন নফস এমনি এমনি সোজা হয়ে যাবে। অর্থাৎ, আপনি যদি ধনী হয়ে থাকেন, তখন নফস'কে

বলবেন—হে নফস, তুই যদি একটা খারাপ কাজ করিস, তাহলে তোকে ১০০ রাকাত নামাজ পড়তে হবে! আর আপনি যদি গরিব হয় থাকেন, তখন নফসকে বলবেন, হে নফস, তুই যদি একটা খারাপ কাজ করিস,তবে প্রত্যেক খারাপ কাজের বিনিময়ে মসজিদে ১০০ টাকা করে দিতে হবে। দু'দিন চার দিন এভাবে ১০০ টাকা করে দিলে, এমনি সে সোজা হয়ে যাবে। কেননা, নিজের উপর চাপ—নফস-ও নিতে পারে না; সেটা দৈহিক হোক, অথবা আর্থিক।

মোটকথা, নফসের ওপর কিছু শাস্তি আরোপ করা আমাদের জন্য খুবই জরুরী। এতে করে ভালো একটা ফলাফল আসবে, ইন শা আল্লাহ। যেমন: প্রয়োজনীয় পানাহার ও বিশ্রামের দিকে খেয়াল রেখে, অতিরিক্ত আরামদায়ক বিশ্রাম পরিহার করা। যে খাবার খেলে টিকে থাকা যায়—সে পরিমাণ খাবার খেয়ে অতিরিক্ত গুলো পরিহার করা। আবার, নফল রোজা, নফল নামাজ, দান-সদকা ইত্যাদি জরিমানা করলেও নফস কিছুটা কান্ত হয়।

একবার আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এভাবে নিজেকে শাস্তি দিয়েছিলেন...

যাইদ ইব্‌নু আসলাম রাযি তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত: উমার ইবনে খাত্তাব রাযি. আবু বকর সিদ্দীক রাযি. -এর নিকট গিয়ে দেখলেন যে, আবু বকর সিদ্দিক রাযি. স্বীয় জিহ্বা ধরে টানছেন। উমার রাযি. বললেন, রাখুন (অর্থাৎ এই রকম করবেন না), আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর আবু বকর রাযি. বললেন, এই জিহ্বাই তো আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।[২৮]

জিহ্বার দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হয়েছিল বলে তিনি জিহ্বাকে টেনে ধরেছিলেন। জিহ্বার উপর শাস্তি আরোপ করেছেন। আর আমরা?! আমরা

---

[২৮] মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদিস - ১৭৯৬

কী করছি? আমাদের নফসের তাড়নায় এত এত গোনাহের কাজে ধাবিত হচ্ছি, তবু নফসের উপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ করছি না!

তাই, নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে, তার আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে, অবশ্যই তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা জরুরী। সে বিগড়ে গেলে তার ওপর কিছু শিক্ষা মূলক শাস্তি আরোপ করা—যেন ধীরে ধীরে নফস দলিত হয়। তবে, এমন কোন শাস্তি আরোপ করবো না— যা শরীয়ত বিরোধী। যেমন: বিয়ে-শাদী ত্যাগ করা, প্রয়োজনীয় পানাহার ও নিদ্রা ত্যাগ করা, ভবঘুরে হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, ইত্যাদি।

নফস নিয়ন্ত্রণ করতে বেশি বেশি আত্মসমালোচনা করুন

এক

নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার আরেকটি সহজ পদ্ধতি হচ্ছে—আত্মসমালোচনা। যে ব্যক্তি সব সময় নিজের সমালোচনায় ব্যস্ত, সে নফসে আম্মারা দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হয়। আর যে ব্যক্তি সব সময় অন্য মানুষের সমালোচনায় ব্যস্ত, সে-ই নফসের কাছে কাবু হয়ে থাকে। এজন্য, যে ব্যক্তি নিখুঁতভাবে আত্মসমালোচনা করতে পারে, সে খুব কমই খারাপ কাজে ধাবিত হয়। বিবেক তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায়! কেননা, যখন কোনো জান্নাত প্রত্যাশী ব্যক্তি নফসের সমালোচনা করে, তখন তার যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি তার কাছে পরিলক্ষিত হয়। ঠিক তখনই, সে স্বীয় নফসকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে। নিজেই নিজের নফসকে শাসাতে শুরু করে। আর এই শাসনের ফলে, নফস খারাপ কাজে অগ্রসর হতে প্রেরণা হারিয়ে ফেলে।

আর তাছাড়া, নিজের নফসের সমালোচনাকারীকে রাসুল সা. জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণকারীকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

শাদ্দাদ ইবনু আওস রাযি. থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সে ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, যে তার নিজের আত্মপর্যালোচনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য (নেক) আমল করে। আর ঐ লোক নির্বোধ, যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহর কাছে অবাস্তব আশা পোষণ করে।[২৯]

---

[২৯] রিয়াদুস সলিহীন - ৬৭

যাহোক, আত্মসমালোচনায় নিজেকে অনেকটা পরিশুদ্ধ করা যায়। আত্মসমালোচনার দ্বারা নিজের কৃতকর্ম গুলো নিজের চোখের সামনে ভেসে উঠে। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা যায়। আত্মসমালোচনা এভাবে করতে পারেন—বিগত এক মাসে অতিবাহিত হওয়া কার্যাবলী গুলি স্মরণ করুন। দেখুন তন্মধ্যে কয়টি ভালো কাজ করেছেন আর কয়টি খারাপ কাজ করেছেন। এরপর এগুলোকেও মনের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করুন। এতে করে বুঝে নিতে পারবেন—আপনার নফস আপনার নিয়ন্ত্রণ আছে, নাকি বাহিরে। এভাবেও করতে পারেন—যখনই নফস কোন কাজে আগ্রহী হয়, তখন ঐ কাজ সম্পর্কে ভেবে দেখবেন—এটা কি ভালো কাজ, নাকি খারাপ কাজ। যদি ভালো কাজ হয় তাহলে করতে পারেন। আর যদি খারাপ হয় তখন নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে সংযত রাখতে হবে।

মোটকথা, নফস নিয়ে সমালোচনা করতেই হবে। অন্যের সমালোচনা বাদ দিয়ে নিজের নফসের সমালোচনা করতে হবে। আজ আমরা যত্রতত্র বসে অন্যের সমালোচনায় ব্যস্ত। একে অন্যকে বলি—দেখেছিস অমুক কী কান্ড-টাই না করলো! কীভাবে পারলো সে এটা করতে? তার কি একটুও লজ্জা-শরম নেই? তার কি একটুও সম্মানবোধ নেই? তার কি আল্লাহর ভয় নেই? সে এত বাজে হলো কীভাবে? ছিঃ ছিঃ!

আরে ভাই! আপনি অন্যের সমালোচনা করছেন। একবারও কি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? নিজের অভ্যন্তরে যে একটি অশ্লীল দানব লুকিয়ে আছে—সেটা কখনো খেয়াল করছেন? অমুক একটি খারাপ কাজ করেছে বলে আপনি তার সমালোচনায় ব্যস্ত। তার নাম ধরে ধরে তাকে ভর্ৎসনা করছেন। তাকে ঘৃনার চোখে দেখছেন। ছিঃ ছিঃ করছেন। একবারও কি নিজের নফসের সমালোচনা করেছেন। তার কৃতকর্মের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেছেন? সে যে পর্ন দেখার জন্য সব সময় মুখিয়ে থাকে, বেগানা নারী দেখলে ছটফট করে, নিজের স্বার্থের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়—এগুলো কি খারাপ কাজ নয়? এজন্য, দৈনন্দিন কয়বার নফসকে

ভর্ৎসনা করেছেন? অন্যের কৃতকর্ম দেখে আপনার তার প্রতি ঘৃনা জন্ম নেয়, অথচ নিজের নফসের কৃতকর্মের জন্য কেন অনুতপ্ত হচ্ছেন না? জানেন ভাই, আরবিতে একটা প্রবাদ আছে, 'সবচে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বা বিচক্ষণ মানুষ হলো ওই ব্যক্তি যে নিজের দোষ-ক্রটি দেখে।' এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি সত্যি বিচক্ষণ? আপনি কি স্বীয় নফসের সমালোচনা করছেন?

শুধু আপনি আর আমি এরকম করছি, তা নয়। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা অন্যের দোষ-ক্রটি নিয়ে সর্বদাই সমালোচনায় মত্ত। অথচ স্বীয় নফস কু-প্রবৃত্তির গোলাম। অধিকাংশ মানুষ নিজের নফসের গোলামীতে ডুবে থেকে অন্যের সংশোধনে বেশি উদগ্রীব! এটি কোনো ঈমানদারের কাজ হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?'[৩০]

নিজেদের দোষ, ভুল-ক্রটিগুলো খুঁজে বের করতে পারলেই নফস পরিশুদ্ধ ও উন্নত হবে। নফসকে পরিশুদ্ধ করতে নফসের সমালোচনার কোনো বিকল্প নেই। তাই, নিজের মধ্যে কোন্ কোন্ দোষ বা ভুলগুলো রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে অবশ্যই আত্মসমালোচনা করতে হবে। এজন্য নিজের চেষ্টা থাকা সবচে বেশি জরুরী। এ চেষ্টার নাম হচ্ছে ইহতেসাব বা আত্মসমালোচনা।

কোনো ব্যক্তি যখন নিজের দোষ বের করতে 'আত্ম-সমালোচনা' করে, তখন সে তা দেখতে পায়; তার দোষগুলো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাই আত্ম-সমালোচনার জন্য, নির্জনে, একান্তে, নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব, কর্তব্য, করণীয়-বর্জনীয়, সফলতা-ব্যর্থতা এবং ভালো ও

---

[৩০] সূরা বাকারা : আয়াত ৪৪

মন্দ কাজগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। নিজের ভালো ও মন্দ কাজগুলো নিয়ে হিসাব-নিকাশ করলেই বেরিয়ে আসবে—নিজের ভালো-মন্দ সব দোষ ও গুণ।

মনে রাখতে হবে—মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য দিয়েছেন বিবেক নামক এক বিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতা। যা দ্বারা মানুষ ভালো-মন্দের বিচার করতে পারে। এ- বিবেক তার মাঝে আয়নার মতো ভালো ও মন্দগুলোকে তুলে ধরে। বান্দাও সে বিবেক-বিবেচনার জোরে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

'বরং মানুষ নিজেই নিজের ব্যাপারে খুব ভালো জানে।'[৩১]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, '(পরকালে) হিসেবের সম্মুখীন হওয়ার আগে তোমরা নিজরা নিজেদের হিসাব নাও এবং (পরকালে) তোমাদেরকে মাপার আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের মেপে নাও। কেননা, আজকের তোমার নিজের এ- হিসাব-নিকাশ করাটা আগামীর হিসাব দেয়ার চেয়ে অনেক সহজ।

তাই প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের উচিত নিজেদের দোষ-ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা এবং তা থেকে নিজেদের সংশোধন করা। পরকালের জীবনকে সুন্দর করা।

দুনিয়ার সফলতার সঙ্গে সঙ্গে পরকালের সফলতার প্রতি জোর দেয়া। প্রতিটি মুহূর্তে মহান রবের কাছে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করা এবং বেশি বেশি তাওবাহ-ইসতেগফার করা জরুরী।

আপনার আমার মাঝে নিজেকে সংশোধনের আগ্রহ বা চেষ্টা থাকলে, ধীরে ধীরে নফসের গোঁড়ামি হ্রাস পেতে থাকবে।

---

[৩১] সূরা কেয়ামাহ : আয়াত ১৪

দুই

আত্মসমালোচনার কিছু উপকারিতা:

১. নিজের দোষ-ত্রুটি নিজের সামনে প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষ স্বীয় ভুল-ত্রুটি জানতে পারে। ফলে তার হৃদয় ভালো কাজের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারে।

২. আত্মসমালোচনা দীনের উপর দৃঢ়তা অর্জনের সবচে কার্যকরী মাধ্যম, যা মানুষকে আল্লাহর দরবারে মুহসিন ও মুখলিছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে।

৩. আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নেয়ামতসমূহ, অধিকারসমূহ জানতে পারে। আর সে যখন আল্লাহ'র নেয়ামত ও তার অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তখন সে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে উদ্বুদ্ধ হয়।

৪. আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষের মাঝে পরকালীন জবাবদিহিতার উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। মাইমুন বিন মিহরান বলতেন, 'মুত্তাকী ব্যক্তি সে-ই, যে নিজের জবাবদিহিতা এমন কঠোরভাবে গ্রহণ করে যেন সে একজন অত্যাচারী শাসক'।

৫. আত্মসমালোচনা জীবনের লক্ষ্যকে সবসময় সজীব করে রাখে। এর মাধ্যমে আমরা অনুভব করতে পারি—আমাদেরকে এই পৃথিবীর বুকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। পার্থিব জীবন শুধু খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টার নয়, এ জীবনের পরবর্তী যে অনন্ত এক জীবন, তার জন্য যে আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে—আত্মসমালোচনা আমাদেরকে সর্বক্ষণ তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৬. মুহাসাবার ফলে কোনো পাপ দ্বিতীয়বার করতে গেলে বিবেকে বাধা দেয়। ফলে পাপের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

আত্মসমালোচনা না করার ফলাফল :

ইবনুল কাইয়িম রহি. বলেন, আত্মসমালোচনা পরিত্যাগ করার অর্থ হলো, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলা। এতে মানুষের অন্তর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ আত্মসমালোচনা পরিত্যাগ করার ফলে দীনের প্রতি তার শিথিলতা চলে আসে, যা তাকে নিশ্চিতভাবেই দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কেবল প্রতারিত আত্মাই আত্মসমালোচনা পরিত্যাগ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে সে কোন কিছুর পরিণাম চিন্তা করে না। সমস্ত পাপ তার কাছে অত্যন্ত সহজ বিষয় হয়ে যায়। অবশেষে একসময় পাপ থেকে বেরিয়ে আসাটা তার কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কখনো যদি সে সৎপথের সন্ধান পায়ও, তবুও সে তার অন্যায় অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করে।(৪)[৩২]

আত্মসমালোচনার পদ্ধতি : আত্মসমালোচনা দু'ভাবে করা যায়। যথা-

১| কোন আমল শুরু করার পূর্বে আত্মসমালোচনা করা : অর্থাৎ, কোনো কাজের সংকল্প করার পূর্বেই সে কাজটি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে— 'কাজটি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের জন্য উত্তম, নাকি ক্ষতিকর? কাজটি কি হারাম, নাকি হালাল? কাজটিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে, নাকি নেই ? অতঃপর যখন মনে হবে, কাজটি উত্তম, তখন আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে কাজে নেমে পড়তে হবে।

আর কাজটি খারাপ মনে হলে, একইভাবে পূর্ণ একনিষ্ঠতা ও তাওয়াক্কুলের সাথে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিদিন সকালে আন্তরিকভাবে

---

[৩২] ইবনুল কাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/৮২।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, যেন সারাদিন সৎ আমলের সাথে সংযুক্ত থেকে অসৎ আমল থেকে বিরত থাকা যায়।

১| আমল শেষ করার পর আত্মসমালোচনা করা : এটা তিনভাবে করা যায়। যথা-

(ক) আল্লাহর আদেশ সমূহ আদায়ের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করা:

আমাদের উপর নির্দেশিত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল গুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করা—আমি কি আমার উপর আরোপিত ফরযগুলো আদায় করেছি? আদায় করলে সাথে সাথে নফল বা মুস্তাহাবগুলো কতটুকু আদায় করেছি? কারণ, ফরযের অপূর্ণতা নফল পরিপূর্ণ করে দেয়।[৩৩]

(খ) অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিত্যাগ করা:

দীনি দৃষ্টিকোণ থেকে এমন কোনো হালাল কাজ, যা করার চেয়ে না করাই বেশী উত্তম মনে হয়, তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। কোনো নির্দোষ কিন্তু গুরুত্বহীন কাজ করে থাকলে তা থেকেও নিজেকে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করা। এভাবে যে, আগামীতে কেন এটা করব? এর দ্বারা কি আমি আল্লাহর পথে আরো অগ্রসর হতে পারব? এর দ্বারা কি দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনে আমার বা মানবসমাজের কোনো লাভ হবে? তা অন্য কোন লাভজনক কাজ থেকে আমাকে বিরত করছে কি? ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেলে, সে পথে আর অগ্রসর না হওয়া।[৩৪]

(গ) ক্ষমা প্রার্থনা করা ও সৎ আমল করা:

পূর্ণ সতর্কতার পরও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো পাপ হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তওবা করা।

---

[৩৩] আবু দাউদ, মিশকাত হা/১৩৩০ সনদ ছহীহ।

[৩৪] ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩৯৪।

সাথে সাথে সৎআমল দ্বারা এই অপরাধের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ভালো কাজ মন্দকাজকে দূর করে দেয়, আর এটা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।'

রাসূল সা. বলেন, 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে সৎআমল কর, যাতে তা মিটে যায়'।[৩৫]

ইমাম শাফেঈ রহি. বলেন,'সবচে জ্ঞানী ব্যক্তি সে-ই, যে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে দুনিয়া তাকে পরিত্যাগ করার পূর্বেই। কবরকে আলোকিত করে, কবরে বসবাস করার পূর্বেই। স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করে, তার সাথে সাক্ষাৎ লাভের পূর্বেই, জামাতে নামাজ আদায় করে, তার ওপর জামাতে নামাজ (অর্থাৎ জানাযার নামাজ) পঠিত হবার পূর্বেই। নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করে, হিসাব দিবসে তার হিসাব গ্রহণ করার পূর্বেই'।

মোটকথা আত্মিক উন্নয়নের জন্য, আত্মসমালোচনার কোনো বিকল্প নেই। আপনি আমি যত বেশি আত্মসমালোচনা করব, তত বেশি আমরা আমাদের নিজের নফসের কৃতকর্মের ব্যপারে অবগত হব। আর যখন নিজের নফসের কৃতকর্ম গুলো আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে, তখন তাকে পরিশুদ্ধ করা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

তাই, আমাদের উচিত অন্যের সমালোচনা রেখে স্বীয় নফসের সমালোচনা করা। এতে করে দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই আলোকিত হয়ে যাবে। নফসের সমালোচনা করতে করতে যখন সে কাবু হয়ে যাবে, তখন দুনিয়াতে সম্মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর পরকালের টা নিজে উপলব্ধি করে নিন....

---

[৩৫] তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩।

রিমাইন্ডার

নফসকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে, তাকে বেশি বেশি রিমাইন্ডার দিতে হবে। তাকে ভীতি প্রদর্শন করতে হবে। কী কী রিমাইন্ডার দিবেন, আসুন জেনে নিই...

১. নফসকে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিন। এজন্য, এই আয়াতটি সব সময় মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে كل نفس ذائقة الموت অর্থ- প্রত্যেক নফস, মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এই আয়াতটি বেশি বেশি তেলাওয়াত করে নফসকে রিমাইন্ডার দিন। তাকে সজাগ করুন। তাকে জানিয়ে দিন—কুল্লু নাফসিন জা-ইক্বাতুল মাউত। এটা হবে তার জন্য একটি রিমাইন্ডার।

   মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে, নফস কিছুটা কান্ত হয়। দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। যখন কেউ একাকী নিভৃতে, গভীর মনোযোগ সহকারে তার অন্তিম যাত্রা নিয়ে চিন্তা-ফিকর করে, তখন তার মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করে। আর সেই ভয় নফসে গোঁড়ামির প্রতিষেধক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এজন্য, নফস নিয়ন্ত্রণে উত্তম মাধ্যম হচ্ছে, মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা। তাকে ভীতি প্রদর্শন করা। আর উক্ত আয়াতটি অর্থসহ মনোযোগ সহকারে বেশি বেশি পাঠ করা।

২. জাহান্নামের আগুনের ভয়। কোনো একদিন এমনি এমনি আগুনে হাত দিয়ে নিজের নফসকে রিমাইন্ডার দিন। আগুনে হাত রাখুন, হাতে আগুন লাগলেও এর ব্যাথা কিন্তু নফস অনুভব করে। তাই, জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে তাকে রিমাইন্ডার দিন। তাকে জানিয়ে দিন, আজকের এই কৃতকর্মের কারণে সেদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

৩. চলমান, ঘটমান অবস্থা দিয়ে নফসকে রিমাইন্ডার দিন। নফস বেশিরভাগ গোনাহের দিকে ধাবিত হয়, দু'টি জিনিস পেতে। ১- যৌবনের ক্ষুধা ২- পেটের ক্ষুধা। এই দু'টি ক্ষুধা নিবারণের জন্য নফস সব সময় মুখিয়ে থাকে। এই দু'টি চাহিদা পূরণ করতে, ভালো-খারাপ হারাম-হালাল কিছুই দেখে না। এজন্য অবস্থাভেদে তাকে রিমাইন্ডার দিতে হবে।

সেদিন আমি একটি আম কেটে খাচ্ছিলাম। আম কাটার সময় আমের চির হাত থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে। হাতের তালুতে তিনবার লাফ খেয়েছে। চতুর্থ বার তাকে আয়ত্বে নিয়ে আসি। মনে মনে ভেবেই নিয়েছিলাম, আমটি হয়তো আর খাওয়াই হবে না। কিন্তু, কীভাবে জানি দু-তিনবার হাতের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে আবার হাতের মুঠোয় আটকে যায়। তখন মনে মনে নফসকে বলি—এটাই রিজিক। এটাই তাকদির। খাবারের জন্য তুই এদিক ওদিক খারাপ চিন্তা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিস, অথচ আমার আল্লাহ্ আমার রিজিকের ফায়সালা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। যা আমার জন্য নির্ধারিত তা হস্তচ্যুত হতে হতে আবার হাতেই আটকে পড়বে। আর তাছাড়া, আমার আল্লাহ আমার জন্য যা বরাদ্দ রেখেছেন, তা আমি ভক্ষণ করবই। আর যা আমার রিজিকে নেই, তা শত চেষ্টা করেও হাসিল করতে পারবো না।

এটাই ঘটমান রিমাইন্ডার! তাৎক্ষণিক কোনো কিছু ঘটে গেলেই, তা দিয়ে নফসকে শিক্ষা দেয়া। আসলে নফসকে বুঝাতে হবে—যা তাকদিরে আছে তা-ই হবে। যা আসার কথা তা আসবেই। মাঝখানে শুধু শুধু হারামে জড়ানো। আমার তাকদিরে লেখা আছে, এই সপ্তাহে আমি এক লক্ষ টাকার মালিক হবো। এটা আগে থেকেই ফায়সালা করা। এটা যেভাবেই হোক আমার কাছে আসবেই। এখন যে ব্যক্তি হারাম রুজিতে জড়িত, সে কিন্তু এক

লক্ষ টাকা অর্জন করতে হারাম পন্থাই অবলম্বন করবে। অথচ, এই টাকাটা তার ভাগ্যে পূর্ব থেকে লেখা ছিলো। এটা এমনি এমনি যে-কোনো উপায়ে সময় সাপেক্ষ তার কাছে আসতো। কিন্তু, সে নফসের তাড়নায় শুধু শুধু হারাম পন্থায় এটা অর্জন করলো। শুধু শুধু এটার মধ্যে খারাপ একটা জিনিস মিশ্রণ করলো।

৪. নফসকে রিমাইন্ডার দিতে একাকী নিভৃতে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে একটু ভাবুন। ভাবুন—আমি কে? আমি কোথায় ছিলাম? আমি কেন এসেছি? আমার কাজ কী? আমার গন্তব্য স্থল কোথায়? আমাকে কোথায় যেতে হবে?

   আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, জগতের কোনো কিছু তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তাহলে আজ আমি কেন নফসের তাড়নায় অনর্থক কাজে লিপ্ত? কেন আজ নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে অনর্থক খেল-তামাশায় সময় ব্যয় করছি? প্রশ্ন করুন, ভালো করে নিজেকে প্রশ্ন করুন! অস্তিত্ব নিয়ে ভাবুন। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে যত বেশি ভাববেন, তত বেশি নিজেকে খুঁজে পাবেন। নিজের মধ্যে নিজেকে সেভাবেই খুঁজুন, যেভাবে আপনি আমি হারিয়ে গেছি নিজের মধ্যে। আজ আমরা আমাদের মধ্যেই হারিয়ে গেছি। নিজের নফসের গোলামী করে পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ভ্রমণ করছি। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে আলোর পথ ভুলে গেছি। সেইসাথে ভুলে গেছি—কে আমি? কোথায় আছি? কেন এসেছি? আবার কোথায় যাবো?

এজন্য, বেশি বেশি নিজের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করে নিজের নফসকে রিমাইন্ডার দিতে হবে। নয়ত নিজের মধ্যেই নিজেকে ঘুরপাক খেতে হবে। হারিয়ে যেতে হবে ধ্বংসাত্মক 'আমি' নামক জগতে।

নফস নিয়ন্ত্রণে নামাজের ভূমিকা

নফস যখন উদ্যত হয়ে যায়, যখন লাগামহীন হয়ে যায়, তখন নামাজের মধ্যে সবচে' বেশি গাফিলতি চলে আসে। নফস সর্বদাই আপনাকে আমাকে নামাজ থেকে বিমুখ রাখার চেষ্টা করে। ফজরে ঘুম থেকে উঠতে গেলেই নফস বলে, আরে ঘুমা ঘুমা; এই আরামের ঘুম রেখে উঠার কী দরকার।

যোহরের ওয়াক্ত আসলে নফস তখন বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততা দেখায়। বলে, আগে কাজ, পড়ে নামাজ; কাজ না করলে খাবি কী? তখন এমনি এমনি ওয়াক্ত চলে যায়; নামাজ আর পড়া হয় না। আসরের ওয়াক্ত আসলেও কাজের দোহাই দিয়ে নামাজ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। আর যুবক হলে খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাগরিবের ওয়াক্ত, এশার ওয়াক্ত এমনি এমনি কেটে যায়; নামাজ আর পড়া হয় না। এভাবে একদিন দুইদিন করে করে, মাস বছরের জন্য আপনাকে আমাকে বেনামাজি বানিয়ে দেয়। নফসের নামাজ পড়তে ভালো লাগে না, তার নামাজে তৃপ্তি আসে না। অন্যান্য কাজে সে সময় ব্যয় করে, কিন্তু নামাজের পড়ার সময় তার হয়না। নামাজ পড়াটা সে সময় ব্যয় মনে করে।(নাউজুবিল্লাহ)

আজ নফসের ধোঁকায় পড়ে আপনি আমি কত নামাজ কাজা করছি। নফসের কথা মতো নামাজ তরক করছি। আজ আমরা নফসের বিরুদ্ধে যেতে পারছি না। নফস সর্বদাই আমাদের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে; আর আমাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে জাহান্নামের দিকে...

নামাজ হলো সমস্ত ইবাদতের মূল। ঈমানের পরই নামাজের কথা বলা হয়েছে। এই নামাজ মুসলিম আর বিধর্মীদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। নামাজ একটি ফরজ বিধান। যা আমাদের উপর অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। নামাজের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে প্রায় ৮০ জায়গায় আলোচনা করা

হয়েছে। নামাজের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুল সা. -ও বহু হাদিসে নামাজের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে কিছু হাদিস জেনে নিই...

এক হাদীসে নবীজী সা. ইরশাদ করেন:

"কোনো বান্দা আর কুফর-শিরকের মাঝে পার্থক্য বোঝা যাবে, তার নামায তরকের দ্বারা।"[৩৬]

অপর আরেকটি হাদীসে রয়েছে...

যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যত্নের সাথে আদায় করবে, কেয়ামতের সময় এ নামায তার জন্য আলো হবে, তার ঈমান ও ইসলামের দলিল হবে এবং তার নাজাতের ওসিলা হবে। আর যে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত নামায আদায় করবে না, কেয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নামায তার জন্য আলো হবে না, দলিল হবে না এবং সে আযাব ও শাস্তি থেকে রেহাইও পাবে না।"[৩৭]

এই হাদীস আমাদের কী ম্যাসেজ দিলো? আমরা যদি নামাজে যত্নবান না হই, তবে হাশরের ময়দানে কী পরিণতি অপেক্ষা করছে—এটা আমাদের চিন্তা করা উচিত। ভাবা দরকার।

নামাজের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন: নামাজের উপকারিতা সম্পর্কে সহিহ মুসলিমে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে...

"বলো তো, তোমাদের কারো ঘরের পাশেই যদি নহরনালা বহমান থাকে, আর সে তাতে দিনে পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুল আল্লাহ!

---

[৩৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪

[৩৭] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৬৫৭৬

কোনো ময়লা থাকতে পারে না। নবীজী বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও উদাহরণ তেমন। এর বরকতে বান্দার গোনাহখাতা মাফ হয়ে যায়।"[৩৮]

হায় আফসোস, নামাজের ব্যাপারে আমাদেরকে কত তাগিদ দেয়া হয়েছে, আমাদের জন্য কত পুরস্কার রাখা হয়েছে, এতদ্বসত্ত্বেও আজ আমরা নামাজ পড়ি না। নফসের ধোকায় পড়ে নামাজ থেকে দূরে সরে আছি। আমরা সবাই জান্নাত কামনা করি, অথচ জান্নাতে যাওয়ার আমল করি না।

আজ নফসের ধোঁকায় পড়ে নামাজ চলাকালীন সময় মসজিদ'কে উপেক্ষা করে বাজারের দিকে যাচ্ছি। পারবো কি সেদিন, এভাবে জান্নাত'কে উপেক্ষা করে জাহান্নামের দিকে যেতে? না, পারবো না। তাহলে কেন আজ নফসের গোলামী করে নিজেকে এভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি? মনে রাখবেন—নফসকে ঠিক না করা অবধি আমাদের নামাজে খুশু খুজু আসবে না। নামাজে মন বসবে না। নামাজে ভালো লাগা তৈরি হবে না। নফসে আম্মারা তো বিষধর কালসাপ! এটাকে সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে আপনি তো সর্বদাই ঝুঁকির মধ্যে থাকবেন।

মানুষ নফসের ধোঁকায় কত সহজেই ফেতনার জালে আটকে যাচ্ছে। কত সহজেই বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। কত সহজেই নফসের গোলামী করে শয়তানকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এ-সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নামাজ খুবই কার্যকরী। নামাজ,সমস্ত আসক্তি'র এক অনন্য মেডিসিন।

নামাজ, সরাসরি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়, তার উপর কখনো নফস কর্তৃত্ব করতে পারে না। যে ব্যক্তি নামাজের মাধ্যমে তার রব'কে পেয়ে যায়, সে কখনো নফসের গোলামী করতে পারে না; সে তখন শুধুমাত্র রবের দাসত্বেই নিজের ভবিষ্যৎ খুঁজে নেয়।

নামাজ সম্পর্কে, এক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

---

[৩৮] সহীহ মুসলিম, হাদিস -৬৬৭

ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

'নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা এবং পাপ থেকে বিরত রাখে'

এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়—নামাজ যাবতীয় অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে, নফসের খোরাক হচ্ছে, যাবতীয় অশ্লীলতা এবং পাপাচার। এখন নামাজ যদি যাবতীয় অশ্লীলতা পাপাচার থেকে বিরত রাখতে পারে, তখন এমনি এমনি তার খোরাক বন্ধ হয়ে যাবে। আর তার খোরাক বন্ধ হয়ে গেলে, সে নিস্তেজ হতে বাধ্য! তাই আসুন নামাজে পাবন্দি করি। নফসকে নিয়ন্ত্রণে আনি।

নফস নিয়ন্ত্রণে যাকাতের ভূমিকা

লোভ-লালসা, কৃপণতা নফসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। লোভ-লালসা নফসের এক প্রকার প্রবৃত্তি। এই লোভ-লালসার কারণে নফস উদ্ধত হয়ে যায়। লোভ-লালসা নফসের এক অনন্য ব্যাধি। লোভ ও কৃপণতা নফসের খুবই নিকৃষ্ট স্বভাব। যারা কৃপণ এবং লোভী, তারা যাকাত দিতে হাত গুটিয়ে নেয়। ফলে, নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে পারে না আবার নিজের ধন-সম্পদও পবিত্র করতে পারে না।

লোভ-লালসা অন্তর বিধ্বংসী একটি স্বভাব। এর কারণে আজ অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত। অপর দিকে যাকাত একজন ব্যক্তির নফসকে পরিশুদ্ধ করে; আত্মিক উন্নয়ন ঘটায়। আর তাছাড়া, যাকাত একটি ফরয বিধান। তা অবশ্যই পালনীয়। এতে রয়েছে ফরয পালনের পাশাপাশি নফসের গোলামীর প্রতিষেধক। তাই আমাদের উচিত ছিলো—যাকাত প্রদানের মাধ্যমে নফসের লোভ-লালসাকে দূর করা। কিন্তু, আজ আমরা নফস থেকে লোভ লালসা দূর করার পরিবর্তে, নফসের গোলামী করে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকছি।

কৃপণতা নফসের একটা ব্যাধি। এই ব্যাধি দূর করতে, অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে; নয়তো নফস ধীরে ধীরে দুরারোগ্য হয়ে পড়বে। তখন সে ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম কোনো কিছু বিবেচনা করবে না। সব সময় হারাম ভক্ষণে মনোনিবেশ করবে। আর তখন হারাম খেতে খেতে নফস অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। ফলে হারাম থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়বে।

যাকাতের চারিত্রিক ফায়দা:

১. যাকাত ব্যক্তিকে দানশীল ও বদান্যদের কাতারে শামিল করে। যখন আপনি দান-সদকায় অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন, তখন নফস ধীরে ধীরে সতেজ হয়ে উঠবে।

২. যাকাত প্রমাণ করে, যাকাত আদায়কারী অভাবীদের প্রতি রহম, দয়া ও অনুগ্রহশীল, আর আল্লাহ্ দয়াশীলদের উপর দয়া করেন।

৩. মুসলিমদের উপর আর্থিক ও শারীরিক সেবা প্রদান অন্তঃকরণকে প্রশস্ত ও প্রফুল্ল করে এবং মানুষের নিকট যাকাত দাতাকে প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ করে তুলে।

৪. যাকাতে রয়েছে লোভ ও কৃপণতা থেকে মুক্তি।

যাকাতের সামাজিক উপকারিতা:

১. যাকাতের ফলে অভাবীদের অভাব দূর হয়, দুনিয়ার অধিকাংশ জায়গায় যাদের সংখ্যাই বেশী।

২. যাকাতের ফলে মুসলিমদের শক্তি অর্জন হয় ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, কারণ যাকাতের একটি খাত জিহাদ।

৩. যাকাত গরীবদের অন্তর থেকে ধনীদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে দেয়। কারণ গরীবরা যখন দেখে ধনীরা তাদের সম্পদ দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন পুরো করে, কিন্তু তাদের সম্পদ থেকে তারা কোনভাবে উপকৃত হয় না, এ কারণে অনেক সময় ধনীদের প্রতি তাদের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম নেয়, যেহেতু ধনীরা তাদের অধিকার রক্ষা করে না, তাদের কোন প্রয়োজনে তারা সাড়া দেয় না। কিন্তু ধনীরা যদি বছর শেষে গরীবদের যাকাত দেয়, তাহলে তাদের অন্তর থেকে এসব

বিষয় দূরীভূত হয় এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

৪. যাকাতের ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও তাতে বরকত হয়। যেমন হাদিসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন সদকা সম্পদ হ্রাস করেনি"।

অর্থাৎ, সদকার ফলে যদিও সম্পদের অংক কমে, কিন্তু তার বরকত কমে না, বরং আল্লাহ তার সম্পদে বরকত দেন এবং তার বিনিময়ে আরো অধিক দান করেন।

অনেকেই আজ নফসের ধোকায় পড়ে যাকাত প্রদানে বিরত রয়েছে। যদিও মাঝে মধ্যে দিতে মন চায়—কিন্তু নফস সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নফস তখন বলে—যাকাত দেয়ার কী দরকার, শুধু শুধু টাকা নষ্ট, মাল কমে যাবে, ইত্যাদি। আসলে, যাকাত দিলে কখনো মাল কমে না; আরো বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও যাকাত প্রদানে নফস পরিশুদ্ধ হয়। যেমন: নফসের ব্যাধি- অহংকার, হিংসা, লোভ, কৃপণতা ইত্যাদি যাকাত প্রদানের মাধ্যমে অন্তর থেকে দূর হয়ে যায়। আর এই ব্যাধি গুলো অন্তর থেকে দূর হয়ে গেলে নফস এমনি এমনি সতেজ হয়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। তাই, আমাদের যাকাত প্রদানে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

লাগামহীন নফস বিষাক্ত সাপের মতো

লাগামহীন নফস হলো বিষাক্ত সাপের ন্যায়। একটি বিষাক্ত সাপ বাড়ির আঙিনায় ঘুরে বেড়ানো মানে, পুরো পরিবারের জন্য আতংকের বার্তা। ঠিক তদ্রুপ আমাদের লাগামহীন নফস আমাদের মাঝে অবস্থান করা মানে, আমাদের জন্য আতংকের বার্তা। সময়মতো তাকে পরিশুদ্ধ না করলে, ইহকাল পরকাল উভয় জগতে পরিতাপের কারণ হবে।

ইতিপূর্বে নফসকে নিয়ন্ত্রণের অনেক পদ্ধতি বর্ণনা করেছি। উক্ত পদ্ধতি গুলো কাজে লাগালে ভালো ফলাফল আসবে, ইনশা'আল্লাহ। তবে এই কথা ভুলে গেলে চলবে না—লাগামহীন নফস কিন্তু একটি বিষাক্ত সাপের ন্যায়।

কিছুদিন আগে একজন সাপুড়ে'কে দেখেছিলাম—গর্ত থেকে সাপ ধরতে। প্রথমে সে কয়েকজন লোক দিয়ে কোদাল শাবল দিয়ে গর্তের উপর থেকে মাটি সরালো। মাটির সরানোর প্রাক্কালে হঠাৎ ওই সাপটি সাপুড়ের দৃষ্টি গোচর হল। তখন সে ওই ব্যক্তিদের বললো, 'আশেপাশে গর্তের সমস্ত মুখ বন্ধ করে দাও এবং শুধুমাত্র সাপের লেজের দিকের গর্তের মুখটা খোলা রাখো।' তারাও তার আদেশ অনুযায়ী ওই গর্তের আশেপাশের সব জায়গা মাটি দিয়ে আবার ঢেকে দিল এবং শুধুমাত্র লেজের পাশ খুলা রাখলো।

বেশ খানিকক্ষণ বাদ, ওই সাপুড়ে, সাপের লেজ ধরলো এবং ঐ লোকদের বললো, 'মাটি দিয়ে তার চারপাশ টাইট করে ফেলো—যেন সে নাড়াচাড়া করতে না পারে।' তারা তার আদেশে তা-ই করলো। যখন মাটি সাপ'টিকে চেপে ধরলো, তখন সে অনেক চেষ্টা করেও নড়াচড়া করতে পারেনি। আর সাপুড়ে ধীরে ধীরে আলতো করে দীর্ঘক্ষণ সময় নিয়ে তাকে গর্ত থেকে বের করে। সে জানে তাকে যদি এক টান দিয়ে বের করে নেয়, তখন সে

ঘাড় বেঁকিয়ে তার উপর আক্রমণ করতে পারে। এমনকি তাকে ছোবলও মারতে পারে। এজন্য তার চতুরপাশ মাটি দিয়ে টাইট করে, আলতো করে লেজের দিক দিয়ে টেনে টেনে সাপটি বের করে। সে জানে—কোনো ধরনের পরিকল্পনা ছাড়া, হুটহাট তাড়াহুড়া করে তাকে বের করতে যায় তখন বিপদ অনিবার্য! এজন্য সে পূর্ণ প্রস্তুতিসহ পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে সময় নিয়ে তাকে গর্ত থেকে বের করে। অবশেষে ওই সাপটিকে সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। অতঃপর তাকে কাবু করতে সক্ষম হয়।

এটা প্রত্যেক সাপুড়ের, সাপ'কে নিয়ন্ত্রণে আনার, তাকে গর্ত থেকে টেনে বের করার একটা পদ্ধতি। প্রত্যেক সাপুড়ে সাপ কে ধরার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করে থাকেন।

আমাদের নফসের ক্ষেত্রেও এরকমটাই করতে হবে। সবকিছুর প্রস্তুতি নিয়ে, পরিকল্পনা অনুযায়ী, ধীরে ধীরে সময় নিয়ে নফসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। কোনো ধরনের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ছাড়াই, হুটহাট তাড়াহুড়া করে যদি তাকে কাবু করতে যান, তখন সুফলের তুলনায় কুফল'টা-ই বেশি হবে। আপনি যদি মনে করেন— আমি আমার নফসকে এক দিনেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবো, এক দিনেই তাকে আমি পরিশুদ্ধ করে ফেলব; তাকে কাবু করে ফেলবো,তবে আপনার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধীরে ধীরে তার গোঁড়ামি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। ধীরে ধীরে তাকে ভালো কাজে অভ্যস্ত করতে হবে। নয়তো সে বিগড়ে গিয়ে উল্টো রিয়েকশান করবে।

কিছু কথন

১. প্রেমে তো সবাই পড়ে। কেউ প্রেমে পড়ে স্রষ্টার; কেউ প্রেমে পড়ে সৃষ্টির। সৃষ্টির প্রেমের প্রেমিক হচ্ছে, নফস। আর স্রষ্টার প্রেমের প্রেমিক হচ্ছে, রুহ। এখন আপনি কোন প্রেমিককে প্রাধান্য দিবেন? যে স্রষ্টার প্রেমে মত্ত হয়েছে তাকে, নাকি যে সৃষ্টির প্রেমে মত্ত হয়েছে তাকে?

২. হাসান বসরী রহি. বলেন: মুমিন তার নফসের হিসাব ব্যতীত সামনে অগ্রসর হয় না। নফস কী করতে চায়, কী খেতে চায়, কী পান করতে চায়—সব কিছু সে হিসাব করে। পক্ষান্তরে, যারা গোনাহগার, তারা নফসের হিসাব ব্যতীতই সামনে অগ্রসর হয়।

৩. যে স্বীয় নফসের অনুসরণ করেছে, সে নিজের দীন বিক্রি করে ধন-সম্পদ ক্রয় করছে। যে নফসের গোলামী করেছে, সে স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে সৃষ্টির দাসত্ব করছে।

৪. হাসান বসরী রহি. বলেন: বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ -এর মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ তার নফসের মধ্যে একজন ওয়াজকারী,নসিহতকারী, সমালোচককারী থাকে।

৫. মাইমুন ইবনে মেহরান বলেন: একজন ব্যবসায়ী শরিকের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে যতটা কঠোরতা করে, তারচে' অধিক কঠোরতা নিজের নফসের সাথে না করা অবধি, বান্দা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে না। এজন্যই নফসকে বলা হয়— নফস তো বিশ্বাসঘাতক ব্যবসায়ী শরিকের মতো; যদি ঠিকমতো হিসাব না রাখেন, তবে সে আপনার সব কিছু নিয়ে চম্পট দিবেই।

৬. মালেক ইবনে দিনার বলেন: আল্লাহ্ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি দয়া করেন—যে তার নফসকে বলে, হে নফস! তুমি এই কাজ করো, আর এই কাজ করো না। অতঃপর, জোর করে তার ওপর লাগাম পরিয়ে দেয় এবং আল্লাহর কিতাবকে তার উপর অপরিহার্য করে দেয়। তখন কুরআন তার জন্য চালক হয়ে যায়। (অর্থাৎ, কুরআন তাকে পথ দেখায়)।

৭. আবু সুফিয়ান রহি. বলেন: যখন কোনো ব্যক্তি ভালো কাজ করার ইচ্ছে করে, তখন তার নফস থেকে সুগন্ধি ছড়াতে থাকে এবং যখন কোনো ব্যক্তি খারাপ কাজ করার ইচ্ছে করে, তখন তার নফস দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে।

৮. তুমি মানব লড়াইয়ে অন্যকে প্রতিহত করে নিজেকে বীর মুজাহিদ দাবি করছো, অথচ প্রকৃত বীর সে, যে স্বীয় নফসের. বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে সংযত রেখেছে।

৯. নফসের কারাগারে বন্দী হয়ে কেউ কখনো সফল হতে পারে না, সফল তো সেই ব্যক্তি—যে মুক্ত স্বাধীন। ব্যক্তি থেকে নয়; স্বীয় নফসের কারাগার থেকে!

১০. নফসের গোলামী তো সে-ই করে, যে স্বীয় রব থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে। একজন প্রকৃত মাওলা প্রেমিক, নফসের আশেক হতে পারে না!

১১. নফসকে যত বেশি পবিত্র রাখবেন, ততোই সে সংযত থাকবে। অপবিত্র নফস শুধু অশ্লীলতার দিকেই আহ্বান করে। অন্তরকে পবিত্র রাখার অবলম্বনই হলো নফসকে সংযত রাখা।

১২. নফসকে চিনতে না পারলে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া কঠিন। কেননা,নফসকে যাচাই বাছাই না করা অবধি নিজের দোষ ত্রুটি

পরিলক্ষিত হবে না। ফলে, ধীরে ধীরে সে গাইরুল্লাহ -এর পথেই হাঁটবে।

১৩. হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রহি. বলেন: উদরপূর্ণ করে পানাহার করলে তা নফসের লালসার চরম মাত্রায় পৌঁছে দেয়। আর তখন মন্দ চাহিদাগুলো তাদের ইচ্ছে পূরণে উঠে পড়ে লেগে যায়।

১৪. হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী রহি. বলেন: দুনিয়াতে নফস ব্যতীত কোন কিছুকেই আমি ভয় করি না।

১৫. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহি. বলেন: নফসের বাসনা যে ত্যাগ করেছে, সে আল্লাহকে পেয়েছে। আর যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে সবকিছুই তার নাগালে এসে গেছে।

১৬. যে ব্যক্তি কু-প্রবৃত্তি দমন করে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়, আল্লাহ প্রকাশ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

১৭. হযরত মালেক বিন দিনার রহি. বলেন: যে সবসময় নফসের অনুগত, শয়তান তার কাছে বেশি যাতায়াত করে না। কেননা, শয়তানের কাজ তো নফসের মাধ্যমেই সম্পাদিত হচ্ছে।

লেখক পরিচিতি

মাহমুদ বিন নূর। একজন উদীয়মান তরুণ আলেমে দ্বীন। বর্তমান সময়ের সম্ভাবনাময় একজন দা'ঈ। মননশীল এবং সৃজনশীল প্রতিভাধর এই লেখক জন্মগ্রহণ করেন হবিগঞ্জ জেলার জালালাবাদ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে।

তিনি পড়াশোনা শেষ করেন কওমি মাদ্রাসা থেকে। ঢাকা'র বড়ো বড়ো ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য ছিলেন বহুদিন। ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন উস্তাদদের প্রাণপ্রিয় ছাত্র। প্রসিদ্ধ শায়েখ-মাশায়েখদের কাছ থেকে নিয়েছেন 'হাদিসে নববীর' ইজাজাহ।

লেখকের লেখালেখির যাত্রা শুরু হয়—'প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি' বই দিয়ে। অতঃপর, আমাদের এই ঠুনকো জীবনে যে-সকল নানাবিধ ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে, ঐ সকল ভুল-ভ্রান্তির সমাধানের লক্ষ্য হাতে নিয়ে লেখক তার দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'দর্পণ' প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে লেখকের উভয় গ্রন্থ পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এছাড়াও তার সম্পাদিত 'আতশকাচে দেখা বাদশাহ হারুনুর রশিদ' নামক একটি বই-ও রয়েছে।

লেখকের তৃতীয় স্বরচিত আত্মশুদ্ধিমূলক গ্রন্থ 'নফসের বিরুদ্ধে লড়াই'। আশা করি এই বইটি-ও পাঠক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করবে, ইন শা আল্লাহ।

ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়া এই দিকভ্রান্ত মুসলিম উম্মাহ'র হাতে আলোর মশাল তুলে দিতে লেখকের অনবরত আপ্রাণ এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। হে আল্লাহ! আপনি এই কলম যোদ্ধা লেখকের লেখনীতে বারাকাহ দান করুন। তার ইলম বৃদ্ধি করে দিন। তার হায়াত ও রিজিকে বরকত দান করুন। তার এই খেদমত গুলো কবুল করে নিন। আ-মিন।

মুহাঃ জুবায়ের মামুন
১৫/০৭/২০২১

আচ্ছা বলুন তো—শুধুমাত্র শয়তান-ই যদি আমাদেরকে গুমরাহ করে, তো শয়তানকে গুমরাহ করেছে কে? শয়তান-ই যদি আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে, তো শয়তানকে পথভ্রষ্ট করলো কে? শয়তানের পূর্বে তো কোনো শয়তান ছিল না, তাহলে শয়তানকে দিকভ্রান্ত করলো কে? শয়তানকে দিকভ্রান্ত করেছে তার নফস। নফস তাকে অহংকারী বানিয়েছে। নফস তাকে উদ্যত করেছে। নফস তাকে দিশেহারা করেছে। নফস তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। এতদসত্ত্বেও, কেন আজ নফসের ব্যাপারে আমরা এত উদাসীন?!

কেন আজ আমরা সবাই নফসের কাছে শেকলবন্দি? উচিত তো ছিল, আমরা নফসকে শেকলবন্দি করব; কিন্তু উল্টো, সে আমাদের শেকলবন্দি করেছে। তাই তো, আমরা নামাজ থেকে দূরে; নেক কাজ থেকে বিরত। অশ্লীল কাজে জড়িত; পাপের সাগরে ডুবন্ত।

বই সম্পর্কে আর কী বলবো, যেখানে বইয়ের নামটাই তার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি। 'নফসের বিরুদ্ধে লড়াই' - এটা শোনা মাত্রই হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছেন—বইটি আসলে কী নিয়ে লেখা। এজন্য, বই সম্পর্কে তেমন একটা বলতে চাচ্ছি না। তবে এতোটুকুই বলবো—বইটি লেখার কাজ সম্পন্ন করে পুনরায় পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে ,'আরে, বইটি তো আমার জন্যই লেখা, এটা তো আমাকে লক্ষ্য করেই লেখা হয়েছে।'